Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০১২৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০১২৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২০১২৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শারমিন খাতুন

(স্বাক্ষর)

শারমিন খাতুন

আইডিঃ ২৩১০০১২০১২৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

পরিবার 3

ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব 13

স্বামী-স্ত্রীর দ্বীনি ইলম 14

বিবাহ পূর্ব স্বামীর করণীয় 22

বিবাহ পরবর্তী স্বামীর করণীয় 48

বিবাহ পরবর্তী স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 62

স্বামীর নিকটে স্ত্রীর অধিকার 83

বিবাহপূর্ব স্ত্রীর করণীয় 85

বিবাহ পরবর্তী স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 89

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব 117

সন্তান প্রতিপালন 133

পারিবারিক শান্তির উপায় 191

কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট 200

নবিজির সংসার 202

কিছু নাসিহা 214

দৈনন্দিন কিছু আমল 216

উপসংহার 217

তথ্যসুত্র 219

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিককে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পরিবার যা সমাজের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর । একই সাথে পরিবারকে বলা হয় নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্ব শর্ত হল একটি আদর্শ পরিবার। আর এই আদর্শ পরিবারের ভিত্তি হলো একজন পুরুষ ও একজন নারী। যারা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেদের নতুন পরিচয় তৈরি করে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে। শুরু হয় তাদের দাম্পত্য জীবন। প্রথমে তারা একটি বর্ধিত পরিবারের শাখা বা প্রশাখা হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে তারাই আবার বর্ধিত পরিবারের মূল বা শিকড়ে পরিণত

হয়। পরবর্তীতে তাদের থেকে শাখা প্রশাখার উৎপত্তি ঘটে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার পর তার বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করলেন আদি মাতা হযরত হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। সৃষ্টির পর আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তাদেরকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং জান্নাতে বসবাসের সুযোগ করে দেন। পরবর্তীতে তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো এবং পর্যায়ক্রমে মানব বিস্তার হতে হতে আমরা শেষ জামানায় এসে পৌঁছেছি । তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম একটি পরিবারের শুরু হয় একজন পুরুষ ও মহিলার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। এবং আমাদের আদি নিবাস ছিল জান্নাত এবং সেই জান্নাতে যাওয়ার জন্যই আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অন্যতম একটি অংশ হলো বিয়ে। এ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে শুরু হয় দাম্পত্য জীবন । গড়ে ওঠে পরিবার। আর এই পরিবারকে জান্নাতমুখী করতে হলে পরিবারকে গড়তে হবে আদর্শ পরিবার হিসেবে। এই আদর্শ পরিবার গড়তে হলে প্রয়োজন ইসলামের অনুশাসন মেনে চল। তবেই একটি পরিবার হবে আদর্শ পরিবার অর্থাৎ ইসলামিক পরিবার। যার মাধ্যমে সৃষ্ট শাখা প্রশাখার পরিবার গুলো হবে ইসলামীক পরিবার। পক্ষান্তরে যদি দাম্পত্য জীবনে গলদ ঢুকে যায় তাহলে এবং ইসলামী আদর্শের ঘাটতি হয়ে যায় তাহলে সেই পরিবার আর ইসলামী পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ পরিবারে ইসলামীকরণ অবশ্যই দূরুহ হয়ে পড়ে। সে কারণে আদর্শ পরিবার গঠনের প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান কাজটি বিবাহ শাদীর পূর্বেই তথা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময়ই করতে হবে। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীর বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হাদিসে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। বংশ বা সামাজিক মর্যাদা অথবা সম্পদ আপাতত দৃষ্টিতে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হলেও দ্বীনদারীকে বাদ দিয়ে শুধু এসবের ভিত্তিতেই পাত্রী নির্বাচন করলে গঠনের শুরুতে ভেজাল প্রবেশ করলো। পাত্রী নির্বাচন মানে একজন স্ত্রী নির্বাচন নয় বরং পাত্রকে মনে রাখতে হবে তিনি তার অনাগত সন্তানের মাকে নির্বাচন করছেন। অনাগত সন্তানের মায়ের মাঝে যদি দ্বীনদারিত্ব না থাকে কিভাবে তার হাত ধরে আদর্শ পরিবার গড়ে উঠবে? কিভাবে তার গর্ভে জন্মাবে নেক্কার সন্তান? যে সন্তান কালিমার পতাকা হাতে নিয়ে ইসলামের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও কূণ্ঠাবোধ করবে না। অপরদিকে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা একটি পরিবারের সন্তান গড়ে ওঠে মা-বাবা উভয়ের হাত ধরে। তাই উভয়কে ধার্মিক হওয়া জরুরী।

কিন্তু আজকাল আমাদের মুসলিম পরিবারের বেহাল দশা। দ্বীনদারিতাকে তারা মূল্যায়ন করে না। মেয়ে কত সুন্দরী মেয়ের বাবার কেমন অর্থ সম্পদ আছে, সামাজিক মর্যাদা কেমন, ছেলে কত ভালো সেলারি পায়,কত বড় ব্যবসা, বাবার কেমন সম্পদ আছে এসবের দিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। অবশ্যই জীবনে চলার পথে এসবেরও খুব প্রয়োজন । কিন্তু উভয়ের মাঝে যদি দ্বীনদারিতা না থাকে তাহলে সন্তানদের ইসলামিক পরিবেশ দিতে পারবে না, সংসারে অশান্তি দানা বাধবে। পরবর্তীতে দুনিয়ায় তাদের জন্য জাহান্নাম হয়ে যাবে এবং আখিরাতের স্থায়ী নিবাস জান্নাত যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

দিনশেষ হাজারো কর্মব্যস্ততার পরে মানুষ পরিবার নামক নীরেই ফিরে। যদি সেই পরিবার হয় ইসলামী পরিবার অর্থাৎ আদর্শ পরিবার, পরিবারে থাকে জান্নাতি পরিবেশ তাহলে পুরো দুনিয়াটাই তাদের যেন জান্নাতে পরিণত হয় । তাহলে আসল জান্নাত কতই না সুন্দর। সেই পরিবার নামক নীড়ে ফিরে তিনি সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে যাবেন। কিন্তু এই নীড়ে যদি থাকে পারিবারিক কলহ তাহলে পুরো দুনিয়াটাই তার জন্য জাহান্নাম হয়ে যাবে তাহলে পরকালীন জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট।

স্বামী স্ত্রী যদি দ্বীনদার হয় তাহলে তারা একটি ইসলামী পরিবার গঠনে একে অপরের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করবে।

পরিবার

পরিবার পরিচিতি :

পরিবার হলো এমন একটি বন্ধন যেখানে দায়িত্ব, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষ একসাথে বসবাস করে। পরিবার এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ জন্মের পর প্রথম ভালোবাসা পায়, প্রথম নিরাপত্তা অনুভব করে, আর ধীরে ধীরে মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। একটি পরিবার বৈবাহিক ও রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কে আছে মায়া, সম্মান, ভালোবাসা,অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য। একটি পরিবারে অনেক সদস্য থাকতে পারে। তবে এর উৎপত্তি ঘটে দুজন ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। স্বামী স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি মিলে ছোট পরিসরে পরিবার বলা হলেও আরো অনেক সদস্য থাকতে পারে। পরিবারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবারে মা-বাবা ও তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততী বসবাস করে। অপরদিকে যৌথ পরিবারে স্বামী-স্ত্রী,, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই -বোন, চাচা-চাচি সহ অনেকেই থাকতে পারে।

পরিবারের সংজ্ঞায় Oxford ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে, a group consisting of one or two parents and their children. 'পরিবার হলো পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান সন্ততির সমষ্টি'।

পরিবারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে আল ফিকহুল মানহাজি গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে "পরিবার বলতে বুঝায় পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে- মেয়ে ও পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে।"

পরিবারের সূচনাকাল :

আমাদের আদি পিতা ও আদি মাতা হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে মানবজাতির প্রথম পরিবার গড়ে ওঠে জান্নাতে। পরবর্তীতে তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং মানব বিস্তারের সূচনা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ করে দিলেন।

তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বললেন, হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো এবং সেখান থেকে যা চাও খুশি মনে খাও কিন্তু তোমরা দুজন এই গাছটির নিকটে যেও না তাহলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সুরা বাকারা, আয়াত-৩৫)

কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পরে তারা উক্ত গাছটির নিকটবর্তী হয়। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা কিছুকালের জন্য তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠান এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বময় মানববিস্তার করেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি তোমরা তোমাদের পালনকর্তা কে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ওই দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন । আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নামে যাঞ্চা করে থাকো এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক।(সুরা নিসা, আয়াত-১)

অন্যত্র আল্লাহ আরও বলেন, হে মানুষ আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে । তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে,যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো।
(সুরা হুযুরাত,আয়াত- ১৩)

অনুরূপভাবে সকল নবী রাসূলের ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবার বিদ্যমান ছিল । আল্লাহ বলেন, তোমার পূর্বে আমরা অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি। (সুরা রাদ,আয়াত-৩৮)

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

পরিবার মানুষের জীবন ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও অপরিহার্য অংশ। এটি শুধু রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের সমষ্টি নয়। বরং ভালোবাসা, দায়িত্ব, নৈতিকতা ও ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান। একটি আদর্শ পরিবারই একটি আদর্শ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। পরিবারই সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে রেখে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না । মানুষের অস্তিত্বের জন্য ও সুষ্ঠু সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি আদর্শ পরিবার প্রয়োজন। যাদের সাথে সে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করবে। পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পারব পরিবার না থাকার ভয়াবহ পরিণাম। সুইসাইডের হার কতখানি বেড়ে গেছে। কোন কোন দেশে দেখা যায় মানুষ ভাড়া নিয়ে একাকীত্ব দূর করার চেষ্টা করে। তাদের সঙ্গে ঘুরতে যায়, কফি শপে যায় । এভাবে তারা তাদের একাকিত্ব দূর করার চেষ্টা করে । যিনি সঙ্গ দেন তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয়। অপরদিকে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালার অশেষ নেয়ামত

হলো পরিবার আলহামদুলিল্লাহ। একটি আদর্শ পরিবারই পারে পরিবারের সদস্যদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে। অপরদিকে এর বিপরীত পরিবার, পরিবারের সদস্যদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন বরবাদ করে অথবা শুধু তাদের দুনিয়ার জীবনটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আর আখিরাত বরবাদ করে। পরিবারের সদস্যরা যদি কুরআন - সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে তাহলে তাদের জীবনটা হয় সুষ্ঠু, সুন্দর ও গোছালো। সংসারে অনাবিল সুখ বিরাজ করে এবং পরকালে জান্নাত যাওয়ার পথ সুগম হয়। কেননা তারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে। কেউ ভুল করলে সেটা শুধরিয়ে দেয়। অপরদিকে বেদ্বীন পরিবার আল্লাহর নাফরমানিতে দিন যাপন কর। যার পরিনাম দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে পরকালের শাস্তি দিবেন ।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যাকে তার স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।(সুরা আস-সাজদাহ,আয়াত-২২)

তাই বলা যায়, আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের জন্য একটি আদর্শ পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নিম্নে আদর্শ পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার আরো বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো -

১)মানববংশ বৃদ্ধি: পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র বস্তু সমূহ হতে রুজি দান করেছেন। (সুরা নাহল,আয়াত-৭২)

২)মানববংশ সংরক্ষণ: পরিবারের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। আল্লাহ বলেন, তিনি মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি বংশগত ও বিবাহ গত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান । (সুরা ফুরকান,আয়াত-৫৪)

মানুষ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান করে এবং প্রতিপালন করে। সন্তান বড় হলে তাদের বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখাশোনা করে, দাদা-দাদীদের সেবা যত্ন করে, পরবর্তীতে সন্তানরাও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান করে এভাবে মানব বংশ রক্ষা হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিরোধ করছে । লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে ইচ্ছাকৃত স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ হারাম।কেউবা ভ্রুণ হত্যা করে। শারঈ কোনো কারণ ছাড়া ভ্রুণ হত্যা হারাম।(সুরা বানী ইসরাইল, আয়াত-৩১)

৩)শিক্ষাপ্রদান: পরিবার শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। যার প্রথম সূচনা ঘটে মূলত মায়ের হাত ধরেই । পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক বাচ্চা কে লালন পালন করা ও শিক্ষা দেয়া। যাতে সে দেশের সামাজিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং একজন দায়ী হতে পারে। ইসলামের কল্যাণে দেশ ও জাতির কল্যানে জীবনকে অতিবাহিত করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক সন্তানই স্বভাব ধর্মের (ইসলামের)উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অত:পর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়। **(বুখারী ও মুসলিম)**

আমরা জানতে পারলাম প্রতিটি শিশুই স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করলেও পরিবারের মাধ্যমেই সে বিপথগামী হয়। ছোট থেকে সঠিক তরবিয়তে সন্তানকে বড় করলে ইসলামের কল্যাণে, দেশ ও জাতির কল্যানে নিয়োজিত থাকবে, সঠিক তরবিয়ত ছাড়া সে বিপথগামী হবে, সকলের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। তাই ছোট থেকেই তার ভিতর ঈমানের বীজ রোপন করতে হবে, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল শেখাতে হবে, পরকালীন জবাবদিহিতা, আল্লাহ ও বান্দার হক, মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেখাতে হবে,এক কথায় বলতে পারি,আল্লাহর বিধানাবলী,আদেশ-নিষেধ তাকে ছোট থেকেই শেখাতে হবে।

৪)শান্তি লাভ ও পারিবারিক মহব্বত সৃষ্টি: পরিবারই মানুষের একমাত্র শান্তির নীড়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ও ক্লান্তি শেষে মানুষ পরিবার নামক নীড়েই ফিরে এবং শান্তি খুজে। তাদের মাঝে থাকে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক ।

আল্লাহ বলেন, আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে এই যে,তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারো আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে। (সুরা রুম,আয়াত-২১)

পরিবারের সদস্যরা একসাথে বসবাসের ফলে নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেবে। একে অপরকে সাহায্য করবে। এটিই পরিবারের চিরচেনা এক রূপ । বর্তমানে ইসলাম বিমুখ জীবন যাপনের ফলে পরিবারের চিরচেনা এই রুপ হারিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে পারিবারিক অশান্তি। পারিবারিক কলহ। সবাই শান্তির খোজে ছুটছে। শান্তিযে রবের দেখানো পথে তা মানুষ চিন্তা করেনা। তাই মানুষ বিভিন্নভাবে এই কলহ দূর করার চেষ্টা করলেও আল্লাহর বিধান ছাড়া পুরোপুরি সম্ভব নয়। পারিবারিক জীবনের যদি আল্লাহর বিধান থাকে তাহলে শুধু দুনিয়াতে কল্যাণ বয়ে আনে তা নয় বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এই বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেন ,তা হলো স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সংকর্মশীল বাপ-দাদা,স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (সুরা রা'দ,আয়াত-২৩)

৫)জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাজত: বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ পরিবার গঠন করে এবং নিজেদের জৈবিক চাহিদা হালালভাবে পূরণ করে এবং নৈতিক স্খলন থেকে বেঁচে যায়।

রাসুল সাঃ বলেন, হে যুবক সম্প্রদায় তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে । (বুখারি-হা/৫০৬৬)

অন্যত্র হাদিসে এসেছে,
জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সওয়াব লাভ ও হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও সাদাকাহ,সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল,আমাদের কেউ জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও তাতে সওয়াব পাবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বললেন,তোমাদের অভিমত কি যে, কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে তা'হলে সে কি গুনাহগার হবে?ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রীর সাথে)জৈবিক চাহিদা পূরণকারী সওয়াব পাবে। (মুসলিম)

৬)পারিবারিক জীবনযাপন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য : মুমিন বান্দাদের অন্যতম গুণ সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপন। কেননা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই আল্লাহ তায়ালা পরিবার দিয়েছিলেন।

মুমিন বান্দারা মহান আল্লাহর কাছে দুয়া করে বলে,
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
হে আমাদের প্রতিপালক,তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও । (সুরা ফুরক্বন, আয়াত-৭৪)

পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ :

পরিবারই মানুষের শান্তির নীড়, নিরাপত্তার প্রধান আশ্রয়স্থল এবং মানসিক শান্তি লাভের স্থান। প্রত্যেকের জীবনে পরিবার তাই গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ পরিবার থাকার

যেমন নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে তেমনি না থাকার রয়েছে নানাবিধ অপকারিতা। নিম্নে কিছু অপকারিতা তুলে ধরা হলো -

১)নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা : ব্যক্তি জীবনে চলতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়, শরীরে দানাবাধে নানাবিধ অসুখ বিসুখ। পরিবার থাকলে একজন অন্য জনের সাথে সমস্যাগুলো আলোচনা করতে পারে, অসুখ-বিসুখে সেবা যত্ন করতে পারে কিন্তু পরিবার বিহীন মানুষ এই সব থেকে বঞ্চিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

২)সহযোগীতা না পাওয়া: পরিবারবিহীন মানুষ সহজে সহযোগিতা পান না। দুনিয়াতে চলতে গেলে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। তা অর্থ দিয়ে হোক, বুদ্ধি দিয়ে বা শ্রম দিয়ে। পরিবারবিহীন মানুষের এসব থেকে বঞ্চিত হন।

৩)নৈতিক অবক্ষয়: পরিবার থেকেই মানুষ নীতি নৈতিকতার শিক্ষা পায়, আল্লাহর বিধানাবলী জানতে শুরু করে। এসব থেকে যখন মানুষ বঞ্চিত হয় তখন কি ঘটতে পারে তা আজ আমাদের চোখের সামনে অহরহ। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, কিডন্যাপ, ধর্ষণ ইত্যাদি। পারিবারিক নৈতিকতার অভাবেও বর্তমানে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় মহামারী আকারে ছড়িয়ে গেছে। যার ফলে সমাজ এক চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে আগাচ্ছে ।

৪)সংসার বৈরাগী: বৈরাগ্য জীবন ইসলাম অনুমোদন করে না। আল্লাহ বলেন, আর বৈরাগ্যবাদ,তা তারা নিজেরাই নতুন ভাবে চালু করেছে। আমরা তাদের উপর এ বিধান অপরিহার্য করিনি । (সুরা হাদীদ,আয়াত-২৭)
আয়াতে খ্রিস্টানদের বৈরাগ্যবাদের কথা বলা হয়েছে। এসব থেকে ইসলাম মানুষকে সাবধান করেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিবাহিত থাকাকে নিষেধ করেছেন।
৫)উদ্দেশ্যহীন জীবন: আমাদের জীবনে সকলের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা । দুনিয়ায় চলতে গেলেও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যা সে নিজে ও পরিবারের সহায়তায় নির্ধারণ করে । সে কখনো লক্ষ্যচ্যুত হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সাহায্য করে।কিন্তু পরিবারবিহীন লোক নিজের লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্য সেভাবে নির্ধারণ করতে পারে না । ফলে সে আল্লাহকে ভুলে বিপথগামী হয়ে যাওয়া সম্ভাবনা থাকে।কারণ পারিবারিক বন্ধনহীন জীবন হলো হাল বিহীন নৌকার মতো। সুতরাং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোন সুস্থ বিবেকবান লোকের সমীচিন নয়।

ইসলামী পরিবার বনাম পশ্চিমা পরিবার :

ইসলামী পরিবার এবং পশ্চিমা পরিবারের কাঠামোগত, সাংস্কৃতিক এবং মূল্যবোধের দিক থেকে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। ইসলামী পরিবার প্রথা ধর্মীয় বিধান, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং পারিবারিক বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে পশ্চিমা পরিবার প্রথা মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

নিম্নে ইসলামী পরিবার বনাম পশ্চিমা পরিবারের মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. পারিবারিক কাঠামো ও বন্ধন:

ইসলামী পরিবার: সাধারণত যৌথ পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে গড়ে ওঠে। এখানে দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-ফুফুদের সাথে সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা (যেমন: ত্যাগ, ক্ষমা ও ভালোবাসা) অটুট থাকে ।

পশ্চিমা পরিবার: মূলত একক পরিবার (Nuclear Family) কেন্দ্রিক। ১৮ বছরের পর সন্তানরা আলাদা হয়ে যায় এবং নিজের মতো করে জীবন যাপন করে, ফলে পারিবারিক বন্ধন অনেক সময় দুর্বল হয়।

২. বিবাহের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামী পরিবার: বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন, যা পরিবার গঠনের মূলভিত্তি।

পশ্চিমা পরিবার: বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি বা পছন্দ। লিভ-টুগেদার বা বিয়ের বাইরে সন্তান ধারণের প্রবণতা পশ্চিমা সমাজে বেশি।

৩. নারীর অবস্থান ও ভূমিকা:

ইসলামী পরিবার: নারীরা মা, স্ত্রী, বোন বা কন্যা হিসেবে সম্মানজনক স্থান পায়। ইসলাম নারীদের ইজ্জত ও সম্মানের ওপর বিশেষ জোর দেয় এবং পরিবারকে নারীর সুরক্ষার স্থান মনে করে।

পশ্চিমা পরিবার: নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে কর্মক্ষেত্রে কাজ করে, তবে অনেক ক্ষেত্রে তারা সামাজিক বন্ধন ও স্নেহ-মমতার অভাবে ভোগে বলে মনে করা হয় ।

৪. বৃদ্ধ বয়সে দায়িত্ব ও যত্ন:

ইসলামী পরিবার: পিতামাতাকে দেখাশোনা করা সন্তানের ওপর ফরজ বা বাধ্যতামূলক। বৃদ্ধ বয়সে তারা সন্তানদের সাথেই থাকে এবং সর্বোচ্চ সম্মান পায়।

পশ্চিমা পরিবার: বৃদ্ধ বয়সে অনেকে কেয়ার হোমে বা একাকী বসবাস করে । সন্তানদের ওপর নির্ভরশীলতা সেখানে নেতিবাচকভাবে দেখা হয় ।

৫. নৈতিকতা ও সমাজ ব্যবস্থা:

ইসলামী পরিবার: ধর্মীয় অনুশাসন ও হালাল-হারামের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় । নৈতিকতা ও লজ্জাশীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ।

পশ্চিমা পরিবার: চরম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রধান্য দেওয়া হয় । এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে ভাঙ্গন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব দেখা দেয় ।

সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বলতে পারি, ইসলামী পরিবার হলো পারস্পরিক দায়িত্ব, স্নেহ ও ধর্মীয় অনুশাসনের একটি সুরক্ষিত কাঠামো, যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে পারিবারিক ও সামাজিক স্বার্থ বড় । বিপরীতে, পশ্চিমা পরিবার ব্যক্তি স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্মমুখর জীবনের প্রতীক, যা অনেক সময় পারিবারিক বন্ধন শিথিল করে দেয় ।

ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব

একটি পরিবারের শিকড়ে থাকে দুজন ব্যক্তি স্বামী ও স্ত্রী। এই দুজন ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পরিচয় বহন করে। তারা কখনো হয় মা-বাবা, কখনো হয় শ্বশুর-শাশুড়ি, কখনো বা হয় দাদা দাদি, নানা-নানি। তাই এই দুইজন ব্যক্তির পারিবারিক দায়িত্বের পরিধি বিশাল। একটি ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকা থাকে মুখ্য। যার মাধ্যমে একটি পরিবার হবে জান্নাতি পরিবার ইসলামী পরিবার। একটি ইসলামী পরিবার গঠন করতে গেলে ইসলাম সম্পর্কেও স্বামী- স্ত্রী উভয়কেই ভালো জ্ঞানার্জন করতে হবে। জ্ঞানার্জন ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না। ইসলামের মৌলিক বিষয় যেমন আকিদা, ফিকহ, কুফর, শিরক, সহিহ শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, সীরাহ ইত্যাদি জানতে হবে। তেমনিভাবে স্বামী- স্ত্রীকে একে অপরের করণীয়, দায়িত্ব, অধিকার সম্পর্কেও জানতে হবে। এবং সবচেয়ে চ্যালেনিজং যে বিষয় তা হলো সন্তান প্রতিপালন। আধুনিকতার ছোয়ায় বাচ্চারাও যেনো একটু বেশি অন্যরকম হচ্ছে। তাদের আচার-আচরণ যেনো অতিরিক্ত জেদী ও আক্রমনাত্মক হয়ে যাচ্ছে। তাই বর্তমান সময়ের

বাচ্চাদের অধিক পরিচর্যার দরকার। আর তাই এ বিষয়ে অধিক জ্ঞানার্জন করা দরকার এবং সেগুলোর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ দরকার।

ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব মূলত তিনভাগে বিভক্ত-

ক)স্বামী স্ত্রীর দ্বীনি ইলম থাকতে হবে।
খ)স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। (স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করণীয়, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব)
গ)সন্তান প্রতিপালন করা।

স্বামী-স্ত্রীর দ্বীনি ইলম

একটি ইসলামী পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হল স্বামী স্ত্রীর দ্বীনি ইলম থাকা। স্বামী স্ত্রী দ্বীনদার হলে, তাদের দ্বীনের জ্ঞান যথেষ্ট থাকলে তাদের সংসার পরিচালনা করা সহজ হবে। কেননা দ্বীনদার ব্যক্তি শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিবেচনা করে চলার চেষ্টা করবে। ফলে তারা সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা করতে পারবে। অপরদিকে কোনো পরিবারের স্বামী স্ত্রীর ইলম না থাকলে তাদের ইলম অর্জন করা জরুরি। ইলমবিহীন জীবন সুখের হয়না। যার ইলম নেই সে আল্লাহকে চিনতে পারবেনা,আল্লাহর হুকুম আহকাম সম্পর্কে গাফেল থাকবে,অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারবেনা। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গাফেল থাকলেও তাদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবোনা। ফলে তার পরবর্তী প্রজন্ম হবে আরো নাফরমান। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে তারা পথভ্রষ্ঠ হবে এবং সংসারে অশান্তি দানা বাধবে। ফলে পারিবারিক কলহ বেড়ে যাবে। আমাদের ইলমের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বেসিক কিছু জানতেই হবে। যেমন-ঈমান ও আরকানুল ঈমান,ইসলাম ও আরকানুল ইসলাম,কুফর-শিরক,ফিকহ,কুরআন সহিহকরণ,সীরাহ ইত্যাদি। আমরা যদি সরাসরি কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে শিখতে না পারি অন্তত অনলাইনে এসব বিষয়ে কোর্স করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ । IOM সহ বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে এই সামগ্রিক বিষয়কে ফরজে আইন কোর্স

হিসেবে চালু করেছে। যার মূল লক্ষ্য হলো অন্তত মানুষ যেনো দৈনন্দিন চলার পথে যতটুকু লাগে ততটুকু যেনো জানতে পারে।

ঈমান ও আরকানুল ঈমান :

ঈমান: ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্য দান ও আমলের সমন্বিত নাম। শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়; অবশ্যই সাক্ষ্যদ্বান এবং আনুগত্য নিশ্চিত করতে হবে। নবী করিম সাঃ এর চাচা আবু তালিব তার ভাতিজার নবুয়তের ব্যাপারে অন্তরে বিশ্বাস করেছিল ঠিকই কিন্তু বাহ্যিক সাক্ষ্য দান ও আনুগত্য ছিল না। ফলে তিনি শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে আমরা জানতে পারলাম বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য -
ক)আন্তরিক বিশ্বাস ২)মৌখিক স্বীকৃতি এবং ৩)অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

আরকানুল ঈমান: ঈমান বিষয়ে জানার পরে আমাদের ঈমানের রোকন গুলো সম্পর্কে জানতে হবে। ঈমানের রোকন ছয়টি -
ক)মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান
খ)ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
গ)মহান আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ সমূহের প্রতি ঈমান
ঘ)রাসূলগণের প্রতি ঈমান
ঙ)আখিরাতের প্রতি ঈমান
চ)তাকদীরের প্রতি ঈমান

উপরিক্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা, ঈমান কিসে ভাঙ্গে কিসে বাড়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। ঈমান বিষয়ক কিতাব গুলো আমাদের অধ্যায়ন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের মনের একান্ত চাওয়া ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা। ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার মধ্যেই রয়েছে আখিরাতের সফলতা। আমরা মহান আল্লাহর নিকট ঈমানী মৃত্যুর জন্য দুয়া করি।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।হাদিসে এসেছে, 'হে আল্লাহ আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করুন। (ঈমানী মৃত্যুর জন্য বিশুদ্ধ ঈমান জরুরী।তাই বিশুদ্ধ ঈমান আনতে হলে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু চাইলে ঈমানের যাবতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আবশ্যক।

ইসলাম ও আরকানুল ইসলাম :

ইসলাম: ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে এ ফিত্বরাতে উপর সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মানব শিশুই এই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে অতঃপর তার বাবা-মা তাকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করে। মহান আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে আমাদেরকে তার অনুগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।আর একজন মানুষের আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণ অনুগত হওয়ার নামই ইসলাম। ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ের নাম। ইসলাম বলতে আকীদা ও আমল উভয়কে বোঝায়। একজন মুসলিম তার আকীদ-বিশ্বাসকে যেমন বিশুদ্ধ করবে ঠিক তেমনি তার আমলকেও বিশুদ্ধ করবে।

আরকানুল ইসলাম :রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকিদা ও আমলের সমন্বয়ে পাঁচটি বিষয়কে ইসলামের রোকন বা খুটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন-১)কালিমা ২)নামাজ ৩) যাকাত ৪) হজ্ব ৫)সাওম।

প্রথম রোকনের উপর বাকি চারটি রোকন নির্ভরশীল। কালিমার মাঝে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এটার উপরেই বাকি চারটি নির্ভরশীল। এই স্বীকৃতির মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য স্বীকার করি এবং ইসলামের বিধি বিধান গুলো পালন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

কুফর :

কুফর হলো ঈমানের বিপরীত অবস্থান—আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.), আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল বা ইসলামের অপরিহার্য কোনো মৌলিক বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, অস্বীকার করা বা সন্দেহ পোষণ করা। আভিধানিক অর্থে কুফর মানে ঢেকে রাখা বা গোপন করা; শরয়ী পরিভাষায় এটি ইসলামের সত্যকে গোপন করা বা প্রত্যাখ্যান করা বুঝায়। কুফর শুধু অবিশ্বাসের নাম নয়, বরং আল্লাহ বা রাসূলের আদেশ-নিষেধ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বা ইসলামের ফরজ বিধানকে উপহাস করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে 'কাফির' বলা হয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি বড় অপরাধ।
আল্লাহকে যারা অস্বীকার করবে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কুরআনের কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হলো -

নিশ্চয় মুশরিক ও আহলে কিতাবের যারা কুফরি করেছে তাদের স্থান জাহান্নামে। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই হলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি জীব।
(সুরা বাইয়্যিনাহ:আয়াত ৬)
সুতরাং কাফেরদের স্থান হবে জাহান্নামে এবং সেখানে তারা সারাজীবন থাকবে।

এছাড়া দুনিয়াতেও কাফিরদের জন্য আজাব রয়েছে। আল্লাহ বলেন,আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকত সমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম ; কিন্তু তারা অস্বীকার করলো।অত:পর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।
(সুরা আল আ'রাফ:আয়াত ৯৬)

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যারা কুফরি করে তারা দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং পরকালেও ভোগ করবে কঠিন আজাব। তাই আমাদেরকে কুফর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে এবং কুফর থেকে আল্লাহর নিকটে পানাহ চাইতে হবে।

শিরক:

শিরক অর্থ অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, অংশী স্থির করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা, সম্পৃক্ত করা। ইংরেজিতে Poutheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস),Sharer,Partner,Associate.
ইসলামি পরিভাষায় মহান আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলী, কর্ম বা ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে **শিরক** বলে। এটি তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) বিপরীত এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরককারীকে 'মুশরিক' বলা হয়, যা আল্লাহর সাথে চরম অবিচার হিসেবে গণ্য।
শিরক মূলত দুই প্রকার:

বড় শিরক (শিরকে আকবর): আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইবাদতে শরিক করা (যেমন- মূর্তিপূজা) বা তাঁর গুণাবলীতে কাউকে সমকক্ষ মনে করা। এটি ঈমান ধ্বংস করে এবং তওবা না করলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তির কারণ।
আল্লাহ বলেন,নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।(সুরা আন নিসা,আয়াত-৪৮)
হাদিসে এসেছে,রাসুল (সা.)বলেছেন,যে ব্যক্তি শিরক করা ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ৯৩)

ছোট শিরক (শিরকে আসগর): লোকদেখানো ইবাদত বা রিয়া। এছাড়া আল্লাহর নামে শপথ না করে অন্যের নামে শপথ করা বা "আল্লাহ এবং আপনি চাইলে..." এ জাতীয় কথা বলা।

উদাহরণ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা, কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কুরবানি করা বা ভাগ্য গণনাকারীর কথা বিশ্বাস করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাওবা ব্যতিত শিরকের গুনাহ কখনোই ক্ষমা করবেননা। তাই আমাদের শিরক বিষয়েও বিস্তারিত জানতে হবে এবং শিরকমুক্ত আমল করতে হবে। নাহলে আমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হবে।

ফিকহ কি ও ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা :

ফিকহ' শব্দের অর্থ গভীর জ্ঞান, উপলব্ধি করা, বা সূক্ষ্মদর্শিতা।
ফিকহ (Fiqh) হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (ঐকমত্য) ও কিয়াস (যুক্তি)-এর আলোকে দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারিত প্রমাণসহ ইসলামি শরিয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধান বা আইনশাস্ত্র। এটি মুসলমানদের হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ এবং ইবাদতের সুনির্দিষ্ট নিয়ম (ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত) বুঝতে সাহায্য করে, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক পথ নির্দেশ করে।

পারিভাষিক অর্থে, বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের আলোকে শরিয়তের শাখাগত বিধি-বিধান (হুকুম-আহকাম) জেনে নেওয়াকে ফিকহ বলে। সহজ কথায়, এটি হলো কুরআন ও হাদীস থেকে আহরিত ইসলামি আইন।
ফিকহের মূল ভিত্তি হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস।

ঈমান আনয়নের পরই দুইটি হক আদায় করার উপর একজন মুসলিমের জীবন আবদ্ধ। একটি হচ্ছে আল্লাহর হক যা হলো ইবাদাহ তথা সালাত, যাকাত, সিয়াম এবং হজ ইত্যাদি। আরে অপরটি হল হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক। যা ব্যবসা, নিকাহ, ডিভোর্স এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই তা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক বা বান্দার হক সম্পর্কিত, এসব অধিকার ও এর বিধান ফিকহের জ্ঞান ছাড়া জানা সম্ভবপর নয়। তাই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইলমে ফিকহের পরিপূর্ণ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এটি এমন একটি মূলনীতি যার দ্বারা মুসলিম তার কাজটি হালাল নাকি হারাম, শুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ তা পরিমাপ করে। বেশ কিছু দৈনন্দিন ইবাদাহ রয়েছে যেগুলো বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায় নাপাক থেকে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন পূর্ব শর্ত।

নিম্নে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো-

১. **সঠিক ইবাদত পালন:** নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলো কখন, কীভাবে করলে শুদ্ধ হবে (ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত) তা ফিকহের মাধ্যমে জানা যায়।

২. **হালাল-হারাম নির্ণয়:** দৈনন্দিন লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে কোনটি বৈধ (হালাল) এবং কোনটি অবৈধ (হারাম) তা স্পষ্ট করে।

৩. **আধুনিক সমস্যার সমাধান:** বর্তমান যুগের নতুন নতুন সমস্যা (যেমন- ব্যাংকিং, চিকিৎসা, প্রযুক্তি) যা কুরআন-হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই, ফিকহবিদগণ দলীল গবেষণার (ইজতিহাদ) মাধ্যমে সেগুলোর বিধান বের করেন।

৪. **শরী'আতের অস্পষ্টতা দূর করা:** হাদীস বা কুরআনের আয়াতের পারস্পরিক বৈপরীত্য দূর করে সঠিক আমলযোগ্য হুকুমটি নির্ধারণ করা।

৫. **দীনের সঠিক জ্ঞান:** ফিকহ হলো দ্বীনের স্তম্ভ, যা মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনে সাহায্য করে।

তাই সঠিক পথে জীবন পরিচালনার জন্য ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য।

কুরআন শুদ্ধভাবে পড়তে জানা :

স্বামী-স্ত্রীর সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখা কেবল ইবাদত নয়, বরং এটি একটি সুখী ও বরকতময় দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি। পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে তেলাওয়াত করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। স্বামী-স্ত্রীর যৌথভাবে কুরআন শেখার প্রয়োজনীয়তার মূল কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো-

শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার সুযোগ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়"। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কুরআন শিখিয়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন।

দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও বরকত: কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঘরে শান্তি ও বরকত নাযিল হয়। স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসে কুরআন পড়লে পারস্পরিক ভালোবাসা ও আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক মজবুত হয়।

জান্নাতের পথে একসাথে চলা: কুরআন কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে। স্বামী-স্ত্রী একসাথে কুরআন তেলাওয়াত ও তা নিয়ে চর্চা করলে জান্নাতের পথে একে অপরের সহযোগী হওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি: কুরআন তেলাওয়াত মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমায়। একসাথে কুরআন চর্চা করলে তা দম্পতিদের জন্য প্রশান্তির কারণ হয়।

উত্তম বংশধর গড়ে তোলা: স্বামী-স্ত্রী দুজনে কুরআনের জ্ঞানে আলোকিত হলে তাদের সন্তানদের মধ্যেও কুরআনের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়, যা একটি জান্নাতি পরিবার গড়তে সাহায্য করে।

ভুল সংশোধনের সুযোগ: স্বামী বা স্ত্রীর একে অপরের কাছ থেকে কুরআন শিখে নেওয়া ভাগ্যের বিষয় এবং এর মাধ্যমে ভুলগুলো খুব সহজেই সংশোধন করা সম্ভব।

সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠন করতে পারে।

সীরাহ কি এবং সীরাহ কেনো জানবো :

সীরাহ বলতে সাধারণত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী, তাঁর কর্মপদ্ধতি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ এবং জীবনের সামগ্রিক ঘটনাবলীকে বোঝায়।

সীরাহ শব্দটি আরবি 'সাইর' (سير) থেকে এসেছে, যার অর্থ পথ বা যাত্রা, অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর জীবন চলার পথে আমাদের ভ্রমণ।
কেন সীরাহ জানবো বা পড়বো, তার প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো-

ইসলামের বাস্তব প্রতিচ্ছবি: রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন জীবন্ত কুরআন। তাঁর জীবনী না জেনে ইসলামকে সঠিকভাবে জানা বা বোঝা অসম্ভব।

আদর্শ জীবন গঠন: পবিত্র সীরাত পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দ্বীন-ঈমান এবং সর্বোত্তম আদব-আখলাক অর্জন করা যায়।

কুরআন অনুধাবন: রাসূলের জীবনী কুরআন অনুধাবনকে সহজ করে দেয়, কারণ তাঁর জীবন ছিল কুরআনের শ্রেষ্ঠ তরজমা ও তাফসির।

আল্লাহর ভালোবাসা ও আনুগত্য: মহানবী (সা.)-এর জীবনী জানলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়ে এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হয়।

ধৈর্য ও শিক্ষা: রাসূলের জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও ধৈর্যের ঘটনা পড়ে আমরা জীবনের পরীক্ষাগুলোতে ধৈর্য ধরতে শিখি।

বিবাহ পূর্ব স্বামীর করণীয়

ইসলামের আলোকে বিবাহ পূর্ব স্বামীর করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। কারণ এটি একটি পবিত্র ইবাদত এবং সারাজীবনের অঙ্গীকার। বিয়ের আগে এই দায়িত্বগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে দাম্পত্য জীবনে সুখ, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হয়। পুরুষ এবং নারী একটি পরিবারের প্রধান দুইটি স্তম্ভ। তবে সৃষ্টির নিয়মানুসারে পুরুষকে কিছু বিশেষ গুণাবলী দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তারা শারীরিক ও বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে নারীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাই তাদেরকে পরিবারের

অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অভিভাবক হিসেবে তার দায়িত্বের পরিধি থাকে বিশাল। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য তাকে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। পূর্ব প্রস্তুতি একটি কাজকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে,একটি উদ্দেশ্যকে সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে। আমাদের সকলের উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদাত,সন্তুষ্টি ও স্থায়ী জান্নাত। বিবাহ স্বয়ং একটি ইবাদাত। নামাজের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরুপ যেমন আমাদের পবিত্র হতে হয় এবং ওজু করে নামাজে যেতে হয় তেমনি বিবাহের পূর্বেও আমাদের কিছু প্রস্তুতি থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরা হলো -

১) নিয়ত যাচাই:একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেক কাজ,প্রত্যেক ইবাদাতের পূর্বে নিজের নিয়তকে যাচাই করতে হবে। নিয়তের কারণেই সাধারণ কাজ ও ইবাদাতে পরিণত হয়। নিয়তের কারণেই বিশাল ইবাদাতো নষ্ট ও বরবাদ হয়ে যায়। হাদিসে এসেছে,সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাই বিবাহের পূর্বেও আমাদের নিয়তকে যাচাই করতে হবে। আমি কেনো বিবাহ করছি? বিবাহের উদ্দেশ্য কি?বিবাহ কি শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণ নাকি আরো অন্য কিছু এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। কেবল নিজের একাকীত্ব কাটানো কিংবা যৌন চাহিদা পূরণ কখনোই বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি, চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন, বৈধ উপায়ে বংশধারা রক্ষা, এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এটি একটি পবিত্র ইবাদত, যার মাধ্যমে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয় এবং পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। যদি সবকিছু মাথায় রেখে বিবাহ করি ইনশাআল্লাহ একটা সুখী দাম্পত্যজিবন উপভোগ করতে পারবো আমরা।

২) মানসিক প্রস্তুতি:একজন পুরুষ যেহুতু একটি পরিবারের মূল অভিভাবক তাই তাকে মানসিক ভাবে প্রস্তু থাকতে হবে যে তিনি একটি বিশাল দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে অনেক কাঠ খড় পোহাতে হবে,অনেক প্রতিকূলতার মাঝ দিয়ে যেতে হবে,অনেক ধৈর্য ধরতে হবে,সংসারে নানান বিষয়ে অশান্তি হতে পারে সেগুলোও সামলাতে হবে ইত্যাদি।।

৩) দুয়া করা:দুয়ার বিকল্প কিছু নেই। দুয়া স্বয়ং একটি ইবাদাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো(সুরা মু'মিন:আয়াত ৬০)। তাই সকল কাজের পূর্বেই আমাদের প্রচুর দুয়া করতে হবে। আমাদের প্রস্তুতির পাশাপাশি অনবরত দুয়া করতে হবে। নিজের চোখের প্রশান্তির জন্য,পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও একসাথে সারাজিবন কাটানোর জন্য, একজন উত্তম নেককার স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানদের উত্তম মা উপহার দেয়ার জন্য আমাদের দুয়া করতে হবে। তাই মুমিনা উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা জরুরী। হাদিসে এসেছে,রাসুল(সা) বলেন,তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।

৪) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা:একজন মুসলিমের ইচ্ছাকৃত গুনাহ করা কখনোই উচিত নয়। আমরা বুঝে না বুঝে অনেক গুনাহ করে ফেলি নফসের ও শয়তানের ধোকায় পরে। বিয়ের আগে তেমনি মারাত্নক গুনাহ হলো হারাম রিলেশনশীপ। এরজন্য আমাদের পরিবার দায়ী,সমাজ দায়ী,রাষ্ট্র দায়ী। আমরা ইসলামের মূলনীতি ভুলে গেছি। শরয়ী সীমারেখা ভুলে গেছি। মুসলিম পরিবারের সন্তানরা অবাধে মেলামেশা করতেছে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ফ্রি মিক্সিং এর ছড়াছড়ি। যার ফলস্বরুপ চারদিকে হারাম রিলেশনশীপ এক কথায় ব্যভিচার চারদিকে মহামারী আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে। স্কুল, কলেজ এমনকি মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরাও এই ব্যভিচারে জড়িয়ে পরছে। আল্লাহর ভয় মনে ঢুকাতে হবে,সবর করতে হবে। এ ধরণের গুনাহ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যাবতীয় সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং শয়তানের প্ররোচনায় পরে গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ওয়াদা করতে হবে যেনো এই ভুল আর না হয়। ছোট থেকে আল্লাহ হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং মানতে হবে।তবেই আমরা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

৫) ঈমানদার ও উত্তম স্ত্রী নির্বাচন :পরিবারের কল্যাণ ও শান্তি শৃঙ্খলার জন্য ঈমানদার নারীকে বিবাহ করা জরুরি। কেননা একজন নেককার স্বামী ও নেককার স্ত্রী মিলেই গঠিত হয় একটি নেককার সুখী পরিবার। কারণ ভালো ও উত্তম মাটি থেকেই উৎপন্ন হয় ভালো ও উন্নত মানের উত্তম ফসল। আর খারাপ ও নিম্নমানের মাটি।থেকে উৎপন্ন

হয় নিম্ন ও অনুন্নত ফসল। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই সতর্ক থাকতে হবে। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাকে মাথায় রাখতে হবে শুধু একজন স্ত্রী না আমি আমার অনাগত সন্তানদের মা নির্বাচন করছি।

কেননা মুমিনা সতি-সাধ্বী নারী স্বামীর সংসার,সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। সাথে সাথে দ্বীনি কাজে সহায়তা করে। এজন্য মুমিনা নারীকে বিবাহ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সে কুৎসিত ও অসুন্দরও হয়।

আল্লাহ বলেন

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰي يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَي النَّارِ ۚۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَي الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।(সুরা বাকারা:আয়াত ২২১)

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত স্ত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি ভালো ভাবে খেয়াল করে সৎ ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা।

যেমনটি হাদিসে এসেছে -

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [মুসলিম ১৭/১৫, হাঃ ১৪৬৬, আহমাদ ৯৫২৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭১৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭১৯)

অন্য হাদিসে আছে,দুনিয়া একটি সম্পদ।আর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেককার সতী নারী।

কুরআন হাদিসের আলোকে জানলাম একজন উত্তম স্ত্রী নির্বাচন করা কতটা জরুরী। উত্তম নারীর(স্ত্রীর)কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন। কেনোনা মুমিনা হওয়ার সাথে সাথে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। তবেই একজন নারীকে একজন স্ত্রীকে একজন উত্তম নারী একজন উত্তম স্ত্রী বলা হয়।

নিম্নে উত্তম নারীর কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

ক)সতি-সাধ্বী,স্বামীর প্রতি অনুগত ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারিণী।
খ)দ্বীন ও ঈমানের কাজে সহযোগী।
গ)স্বামীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা বিনিময়কারিণী
ঘ)স্বামীকে মুগ্ধকারিণী।
ঙ)স্বামীর বিপদাপদে তাকে শান্তনা দানকারিণী।
চ)স্বামীর চাহিদা পূরনকারিণী।
ছ)স্বামীর অধিকার পূরণে অগ্রগামী।
জ)খরচের ক্ষেত্রে স্বামীকে কষ্ট দেয়না।
ঝ)নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারী।
ঞ)স্বামীকে সম্মান করে ও তাকে কষ্ট দেয়না।
ট)বাড়িতে অবস্থান করে।
ঠ)স্বামীর গোপনীয় বিষয় ও উভয়ের মধ্যবর্তী বিশেষ কাজ প্রকাশ করেনা।
ড)সন্তানের প্রতি স্নেহশীলা।

ঢ)লজ্জাশীলা।

উত্তম নারীর সাথে নিন্দিত নারীর বৈশিষ্ট্যও আমাদের জানা জরুরী।নিম্নে নিন্দিত নারীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

ক)স্বামীর অবাধ্যতা করা।
খ)স্বামীকে রাগান্বিত করা।
গ)বিনা কারনে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া।
ঘ)বেপর্দা চলাফেরা করা।
ঙ)অন্যের গৃহে স্বীয় বস্ত্র উন্মোচনকারিণী(পরকিয়া)
চ)পরপুরুষকে স্বামীর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দানকারিণী।
ছ)ব্যভিচারিণী।
জ)পুরুষের বেশ ধারণকারিণী।
ঝ)পরচুলা ব্যবহারকারিণী ও উল্কিকারিণী।
ঞ)গান বাজনায় অভ্যস্ত নারী।

৬) ইস্তেখারা করা:বিয়ের পূর্বে ইস্তেখারা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এটি জীবনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ইস্তেখারা অর্থ আল্লাহর কাছে কল্যান চাওয়া। বিয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে ইস্তেখারার দোয়া পাঠ করতে হয়। এরপর নিজের মনের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। বিয়ের পূর্বে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই ইস্তেখারা করবে। এটি উভয়েরই আমল। বিয়ের পূর্বে ইস্তেখারা করার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. আল্লাহর কল্যাণ কামনা: ইস্তেখারা শব্দের অর্থই হলো 'আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়া'। বিয়ের মাধ্যমে আপনি নিজের দ্বীন ও জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক গড়তে চাইছেন, সেটি আপনার জন্য কল্যাণকর হবে কি না, তা আল্লাহর কাছে জানতে চাওয়া হয়।

খ. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ: মানুষ হিসেবে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। ইস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহ অদৃশ্য জ্ঞান থেকে আপনার জন্য সর্বোত্তম জীবনসঙ্গী নির্বাচনে সাহায্য করেন।

গ. আত্মিক প্রশান্তি ও অকল্যাণ থেকে সুরক্ষা: ইস্তেখারা করলে মনে যে সিদ্ধান্ত বারবার আসে, তাতেই সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ লুকিয়ে থাকে। যদি প্রস্তাবটি ক্ষতিকর হয়, তবে আল্লাহ সে সম্পর্ক থেকে দূরে সরিয়ে দেন।

ঘ. সুন্নত আদায়: রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ইস্তেখারার বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এটি আল্লাহর ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল বৃদ্ধির একটি মাধ্যম।

ঙ. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ: ইস্তেখারার দোয়ায় বিশেষভাবে বলা হয়, "যদি এই বিবাহ আমার দ্বীন, জীবিকা ও ভবিষ্যতের জন্য ভালো হয়, তবে তা সহজ করে দিন"

৭) উপার্জন হালাল হওয়া : ইসলামে স্বামীর উপার্জন হালাল হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি পারিবারিক, আধ্যাত্মিক এবং আখিরাতের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। নিচে এর মূল কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত: হারাম উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত খাদ্য ও বস্ত্র দ্বারা শরীর গঠিত হলে ইবাদত কবুল হয় না। হাদিসে এসেছে, হারাম উপার্জনে গঠিত শরীর দোযখের আগুনে দগ্ধ হবে।

খ. পারিবারিক বরকত ও শান্তি: হালাল উপার্জনে সংসারে বরকত আসে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বজায় থাকে। হারাম উপার্জন পরিবারে অশান্তি, অভাব ও অভিশাপ নিয়ে আসে।

গ. সন্তান ও স্ত্রীর চারিত্রিক গঠন: হালাল আহার সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের চরিত্র গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। হারাম আহার মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে।

ঘ. আল্লাহর নির্দেশ ও ভয়: আল্লাহ তাআলা হালাল উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সুদসহ যাবতীয় হারাম ব্যবসা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাকওয়া (ভয়) প্রকাশ পায়।

ঙ. নারীর অধিকার ও দায়িত্ব: ইসলামে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ দেওয়া স্বামীর ওপর ফরজ। এই ভরণপোষণ অবশ্যই হালাল উপায়ে অর্জিত হতে হবে, যাতে পরিবার সুস্থ ও হালাল পন্থায় জীবনযাপন করতে পারে।

৮.অভিভাবকের অনুমতি: কোনো মুসলমান যুবক-যুবতীর জন্য উচিৎ হবে না মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করা বা নিজ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া। মা-বাবাকে যে কোনো মূল্যে রাজি করিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে,নতুবা তাদের সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাদের অসন্তুষ্টিতে কোনো কিছু করা কখনো মঙ্গলজনক হবেনা। এবং না হওয়াই যুক্তিসংগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা।(সূরা:১৭/২৩)

অমুক ব্যতীত জীবন অচল এমন মনোভাব পরিহার করুন।বরং সর্বদা আল্লাহর হুকুম ও নবীজ সা: এর ত্বরিকায় জীবন পরিচালনা ও ক্ষণস্থায়ী লোভ-লালসা পরিহারের মনোভাব তৈরী করাই সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

মাতাপিতাকে না জানিয়ে বালিগ ছেলে মেয়ের বিবাহ নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক উলামায়ে কেরাম অভিভাবকহীন বিয়েকে বাতিল বলে মনে করেন। হানাফি মাযহাব মতে কু'ফু হিসেবে ছেলেটি মেয়ের সমকক্ষ বা বেশী মর্যাদার অধীকারী হলেই কেবল বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। নতুবা মেয়ের অভিভাবকের অনুমতির উপর বিয়ে মওকুফ থাকবে।
তবে ছেলে গায়রে কু'ফু হলে মহিলার অভিবাবকের অনুমতি অত্যাবশ্যকীয়। তথাপিও মা-বাবার সন্তুষ্টি সন্তানের জন্য মঙ্গলজনক।

৯.পাত্র-পাত্রীর সম্মতি:বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র- পাত্রী বা বর-কনে হল মূল। যারা সারা জীবন একসাথে ঘর সংসার করবে। সে কারণে বিবাহের পূর্বে তাদের সম্মতি থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন ছেলে মেয়ের অসম্মতিতে তাদেরকে বিবাহ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন,يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا হে ঈমানদারগণ!তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে,তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে'।(সুরা নিসা:আয়াত ১৯)

নবী করীম (সা.)বলেছেন,বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন,তার অনুমতি কিভাবে হয়? তিনি উত্তরে বললেন, 'চুপ' থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি। (বুখারি হা/৫১৩৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যুবতী-কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পিতাকে তার অনুমতি নিতে হবে। আর তার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা। (মুসলিম হা/১৪২১)

বিবাহের প্রস্তাব শোনার পর কুমারী মেয়ে চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু অকুমারী মহিলার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অকুমারী মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে অলির থেকে অধিক হকদার। (মুসলিম হা/১৪২১)অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জনৈকা মহিলার সম্মতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন। (বুখারী হা/৫১৩৮)

এছাড়াও কোন মেয়েকে অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে।

১০. পাত্র -পাত্রীর সমতার দিকে লক্ষ্য করা: দ্বীনদারী, পরহেজগারিতা, বংশমর্যাদা ও আর্থিক দিক সহ বিভিন্ন দিকে সমতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা জরুরী। বিশেষত দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে সমতা না থাকলে পরিবারের অশান্তি বিরাজ করে।

এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ভবিষৎ বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা অর্থাৎ কুফু বিবেচনায় বিবাহ করো,আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো।(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮)

তবে বিবাহে সমতা হবে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে। যেমন আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহ.) বলেন,তবে জানা আবশ্যক যে সমতা হচ্ছে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে।(সিলসিলাহ ছহীহা হা/১০৬৭- এর আলোচনা দ্র.)

১১)বিবাহের প্রস্তাব: বিয়ের প্রস্তাব নারী পুরুষ যে কেউ দিতে পারবে। পাত্র-পাত্রী তাদের যে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে। তারা অভিবাবকের মাধ্যমে বা সরাসরি একে অন্যকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে। বিয়ের প্রস্তাব প্রদাণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নিয়ে কোনো ভেদাভেদ নাই। পাত্র পক্ষ বা পাত্রী পক্ষ যে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে। পুরুষ সে তার পছন্দ-অপছন্দকে প্রকাশ করতে পারে,ঠিকতেমনি নারীও তার পছন্দ-অপছন্দকে প্রকাশ করতে পারবে। এবং বিয়ের প্রস্তাবও দিতে পারবে।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন মাদাইয়ানে গেলেন তখন দুই নারীর পশু জন্তুকে পানি খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরহেজগার দুই মেয়ের একজন নিজ থেকেই পিতার কাছে হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বিয়ে করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা সুরা কাসাসে তা এভাবে তুলে ধরেছেন-

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।(সুরা কাসাস : আয়াত ২৫)

তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মেয়েকে যখন কেহ বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে,তাহলে সেই প্রস্তাবের কোনো ফায়সালা হওয়ার আগে অন্য কোনো মুসলিমের সেই বিবাহে প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি নেই।
তবে সে যদি অনুমতি দেয়,তাহলে জায়েজ আছে।

,
হাদীস শরীফে এসেছে,
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. "

আহমাদ ইবন আমর ইবন সারাহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের সময়ে ক্রয় না করে। অবশ্য সে যদি অনুমতি দেয় তবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

(মুসলিম ১৪১২, আবূ দাউদ ২৯৮১, নাসায়ী ৪৫০৪, ইবনু মাজাহ ১৮৬৮, আহমাদ ৪৭২২, দারিমী ২২২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৬৬, সহীহ আল জামি‘ ৭৬০০)

১২. পাত্র-পাত্রী দেখা: বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রী একে অপরের সাথে মাহরামের উপস্থিতিতে দেখা করতে পারবে। এবং দেখা করা উচিত। যাতে পরস্পরের মাঝে মহব্বত সৃষ্টি হয়।

মুগীরা বিন শু'বা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী,নাসাঈ,ইবনু মাজাহ,মিশকাত হা/৩১০৭)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত,
عن أبي هريرة، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟»، قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصارشيئا«

তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পাশে বসা ছিলাম। একব্যক্তি এসে বলল, আমি আনসারি এক মহিলাকে বিয়ে করতে চাই। রাসূলুল্লাহ বললেন,তুমি কি পাত্রী দেখেছো? তিনি বললেন,না। রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন,যাও গিয়ে পাত্রী দেখে আসো। কেননা আনসারীদের চোখে নীল বা এ জাতীয় কিছু থাকে।
(সহীহ মুসলিম-১৪২৪)

বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পূর্বে বায়োডাটা প্রেরণ করা হবে। তবে ছবি প্রেরণ করা যাবে না। বরং পাত্র পক্ষের কোনো এক মহিলা সরাসরি পাত্রীকে দেখে আসবে।
আর প্রস্তাব দেয়ার পর যথাসম্ভব সরাসরি দেখার চেষ্টা করা হবে। কেননা যে হেকমতে পাত্রী দেখার কথা বলা হচ্ছে,সেটা একমাত্র সরাসরি দেখার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। হ্যা কোনো কারণে (যেমন পাত্র থেকে পাত্রী অনেক দূরে অবস্থানরত) যদি পাত্র-পাত্রীকে সরাসরি দেখা সম্ভব না হয়,তাহলে ভিডিওকলের মাধ্যমে কিছু শর্তসাপেক্ষে দেখা যেতে পারে। কেননা ছবির তুলনায় ভিডিওর হুকুমে কিছুটা শীতিলতা রয়েছে।

তবে আমাদের সমাজে পাত্রী দেখার জন্য পাত্রের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন মিলে ছোটখাটো একটা দল পাত্রীর বাড়িতে যায়। এখানে গায়রে মাহরাম মেইনটেইন করা হয়না। পাত্রের বাবা,চাচা,দুলাভাই,নানা,দাদা সবার সামনে মেয়েকে মুখ দেখাতে হয়। সবার সামনেই মাথার কাপড় সরিয়ে চুল দেখে,হেঁটে দেখে ইত্যাদি কাজ করে। সকলে মিলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে। মনে হয় যেনো পাত্রীর ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। এগুলো

শরীয়া সম্মত নয়। এভাবে বিয়ের আগে পাত্র ব্যতিত পাত্র পক্ষের কোনো পুরুষ লোক মেয়েকে দেখতে পারবেনা। যদি এভাবে দেখা করা হয় তা অন্যদের জন্য যেনার শামিল। আবার বিয়ের সময় মেয়ের রূপ লাবণ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয় দ্বীনদারীর পরিরবর্তে। অথচ হাদিসে দ্বীনদারীতাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে ছেলে-মেয়ে ঘুরতে যাওয়া,একান্তে সময় কাটানো,মেসেজ বা কলে কথা বার্তা বলা সবকিছুই শরীয়া বহির্ভুত কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রী লোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে। (বুখারী হা/৩০০৬)

কেননা অন্য হাদিসে এসেছে, কোনো পুরুষ-মহিলা নির্জনে যদি একত্রিত হয় তখন তৃতীয়জন হিসেবে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয়। (তিরমিযী হা/১১৭১)

১৩. সুন্নাতী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা: ইসলাম কেবল কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত এই জীবনবিধান মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। আমাদের সকলের জীবনের অন্যতম জীবনঘনিষ্ঠ একটি অংশ হলো বিবাহ। আমাদের প্রত্যেক কাজেই যেহুতু রাসুল(সা.) এর অনুসরণ করা উচিত তাই বিবাহের ক্ষেত্রেও একই মত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে গান -বাজনা, বেপর্দা, অশ্লীলতা, অপচয়, যৌতুক ইত্যাদি শরীয়ত বিগর্হিত কাজ দেখা যায়। এতে বিবাহ নামক ইবাদতের সওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয় বর কনে ও সংশ্লিষ্ট সকলে। অথচ বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল। আর বাকি অর্ধেকে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। (মিশকাত হা/৩০৩৬)

বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল আযাদ প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেকবান দু'জন মুসলিম পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা স্বাক্ষীর সামনে পাত্র/পাত্রি প্রস্তাব দিবে

আর অপরপক্ষ পাত্র/পাত্রি তা কবুল করবে। আর সাক্ষিগণ উভয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনবে। সুতরাং বিয়ের মজলিসে সাক্ষীর উপস্থিত ছাড়া বিয়ে সহীহ হবে না।

,

হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بَاطِلٌ

আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অভিবাক ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতিত বিয়ে শুদ্ধ হয় না। যে বিবাহ অভিবাক ও সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতিত হবে তা বাতিল। (সহিহ ইবন হিব্বান ৪০৭৫)

,

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে-

فى الدر المختار- (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) (الدر المختار ، كتاب النكاح(3/9-،

অনুবাদ-বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্ত হল শরীয়তের মুকাল্লাফ [যাদের উপর শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়] এমন দুইজন আযাদ পুরুষ সাক্ষি বা একজন আযাদ পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষি হতে হবে, যারা প্রস্তাবনা ও কবুল বলার উভয় বক্তব্য স্বকর্ণে উপস্থিত থেকে শুনতে পায়। {আদ দুররুল মুখতার-৩/৯, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৬৮}

,

বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল মৌলিকভাবে দু'টি। যথা-

১-ইজাব কবুল হওয়া।

২-দুইজন মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা উক্ত ইজাব কবুল স্বকর্ণে শুনা।

,

ব্যস উক্ত দু'টি শর্ত পাওয়া গেলেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

যার পুরোপুরি ব্যাখ্যা হলোঃ-

স্বামী স্ত্রীকে ইজাব তথা প্রস্তাব দিবে বা কোন ব্যক্তিকে উকিল বানিয়ে স্বামীর পরিচয় ও দেনমোহর উল্লেখ করে প্রস্তাব দিবে, আর স্ত্রী সেই প্রস্তাবকে কবুল করবে। কিংবা স্ত্রী নিজে স্বামীকে প্রস্তাব দিবে আর স্বামী তা কবুল করবে, কিংবা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে তার উকীল গিয়ে স্বামীকে প্রস্তাব দিবে আর স্বামী তা কবুল করবে। আর উক্ত প্রস্তাব এবং কবুল বলার বিষয়টি উপস্থিত থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক দুইজন মুসলিম পুরুষ বা একজন

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও দুইজন মহিলা স্বকর্ণে শুনবে। তাহলেই শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

তবে আরেকটি প্রশ্ন আসে যে,বি**য়ের খুতবা কখন, কীভাবে পড়তে হয়?**
বিয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ বিয়ের খুতবা। সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুলের আগে বিয়ের খুতবা পড়া সুন্নত। তবে খুতবা পড়া ফরজ কিছু নয়। এজন্য শরীয়ত নির্ধারিত সাক্ষীর উপস্থিতিতে যদি বিশুদ্ধভাবে বিয়ের ইজাব-কবুল হয়ে যায় এবং উপস্থিত সাক্ষীরা ইজাব-কবুলের শব্দগুলো শুনে তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।
ইজাব-কবুলের আগে খুতবার শব্দগুলো পড়া না হলেও এতে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব পড়বে না। (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, ৬১২২৫৩ ফতোয়া, ১২৬২-৯৫৩)
এই খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নত। তবে বসে দিলেও কোনো গুনাহ নেই। তাতে বিবাহের কোনো ক্ষতি হবে না। (জামেউল ফাতাওয়া,ইসলামী ফিক্হ ও ফাতওয়া বিশ্বকোষ) তবে অবশ্যই খুতবা আরবীতে দিতে হয়

১৪. মোহর প্রদান করা: সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা প্রত্যেক স্বামীর উপর ফরজ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا,

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও। (সুরা নিসা:আয়াত ৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:٢٤]
অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা গ্রহণ করবে,তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। [সূরা নিসা-২৪]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে যদি মোহরানা নির্ধারন হওয়ার পর স্ত্রী যদি (মোহরানা মাফ করে দেওয়া বা কম করে দেওয়া বা বাকি রেখে অন্য সময়ে দেওয়া) কোনো বিষয়ের উপর স্বামীর সাথে একমত হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।
সুতরাং স্ত্রীর সম্মতিতে মোহরানা বাকি রাখা জায়েজ আছে।

তবে কেউ যদি বিবাহ করে এই নিয়তে যে মোহরানা সে পরিশোধ করবেনা তাহলে মারাত্নক গুনাহ হবে।হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করল এই নিয়তে যে সে মোহর পরিশোধ করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী'।(বাযযার,সহীহ আত-তারগীব হা/১৮০৬)

আবার অনেকের মনে প্রশ্ন আসে যে,মোহর কি সব একবারেই পরিশোধ করতে হবে?

শরীয়তের বিধান হলোঃ দেনমোহর বিয়ের আকদের পর প্রদান করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে সহবাসের পূর্বে প্রদান করাই উত্তম। তবে যদি স্ত্রী দেনমোহর প্রদান করা ছাড়াই সহবাসের অনুমতি প্রদান করে তাহলে কোন সমস্যা নেই। বাকি স্ত্রী দেনমোহর প্রদান করা ছাড়া প্রথম সহবাসের পূর্বে বাঁধা প্রদান করতে পারবে। কিন্তু একবার সহবাস হয়ে গেলে আর বাঁধা দিতে পারবে না। কিন্তু স্বামীর জিম্মায় দেনমোহর আদায় না করলে তা ঋণ হিসেবে বাকি থেকে যাবে। স্ত্রী যদি উক্ত দেনমোহর মাফ না করে, আর স্বামীও তা পরিশোধ না করে, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে স্বামী অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাই দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে দেয়া জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ
واحل لكما ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما
উল্লিখিত নারীরা ছাড়া অন্যদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, যে স্বীয় সম্পদ দ্বারা প্রয়াসী হবে তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে, ব্যভিচারে নয়। অতএব তাদের নিকট থেকে তোমরা যে আনন্দ উপভোগ করেছ (সে কারণে) তাদের ধার্যকৃত মোহর তাদেরকে প্রদান করবে। আর মোহর নির্ধারিত থাকার পরও কোনো বিষয়ে পরস্পর

সম্মত হলে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(সূরা নিসা : ২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن[٥:٥] ّ◌َ
তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। [সূরা মায়িদা-৫]

তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। [সূরা মুমতাহিনা-১০]

আবার অনেকের মনে প্রশ্ন আসে,**কতটুকু দেনমোহর করা উত্তম?**

সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী মোহরের কোন নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা নেই। কেননা কুরআন-হাদীসের এমন কোন প্রমাণ নেই যা এ ব্যাপারে নির্দেশ করে। ইমাম শাওকানী বলেন, ‘‘মোহরের আধিক্যের সীমা না থাকার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।’’
ইরশাদ হয়েছে, وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ ًشَيْئا ‘‘তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।’’ (সূরা আন নিসা, আয়াত ২০)। এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মোহরের সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই।

একদা উমার (রা) খুতবায় ৪০০ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা যদি তা পার্থিব জীবনে সম্মানের বস্তু হত অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বস্তু হত, তবে তা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর এবং তাঁর কোন কন্যার জন্য বার উকিয়ার বেশী মোহর ধার্য করেননি। মিম্বর

থেকে নামার পর জনৈক কুরাইশী মহিলা তাঁকে বলল, হে উমার! এটা আপনার এখতিয়ারভুক্ত কোন বিষয় নয়। উমার (রা) বললেন, কেন? মহিলাটি বলল, কারণ আল্লাহ বলেছেন, ‘‘যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে।’’ (সূরা আন নিসা, আয়াত ২০) এ কথা শুনে উমার (রা) বলেন, একজন মহিলা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। সবাই উমারের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। অতঃপর তিনি পুনরায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে স্ত্রীদের মোহর ৪০০ দিরহামের বেশী ধার্য করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে যত খুশী স্ত্রীকে প্রদান করতে চায় (সে যেন তা প্রদান করে)।

তবে মোহর বেশী নির্ধারণ না করাই উত্তম। ইমাম শাওকানী বলেন, ‘‘কারণ মোহরের পরিমাণ কম হলে বিয়ে করা কঠিন হবে না। ফলে এতে কাঙ্খিত বিয়ের সংখ্যা বাড়বে, গরীবরাও বিয়ে করতে সমর্থ হবে এবং বংশ বিস্তার লাভ করবে, যা বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে মোহর যদি বেশী হয় তাহলে বড় লোকেরা ছাড়া অন্যরা বিয়ে করতে সমর্থ হবে না। ফলে সংখ্যাধিক্য গরীবরা অবিবাহিত থেকে যাবে। এতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাধিক্যতা অর্জিত হবে না, যে ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকনির্দেশা প্রদান করেছেন।’’

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে লোহার আংটি ও কুরআনের আয়াত শিক্ষা দানকে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল। আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে একটি বর্ম মোহর হিসেবে প্রদান করে বিয়ে করেন।
বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এক ইলমের মজলিসে তার ছাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নিকট কি আছে? সে বলল, আমার নিকট মাত্র ১ দিরহাম আছে। সাঈদ বললেন, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিলাম।

মোহরের নিম্নসীমা নিয়ে ইমামদের মতামত:

১। হানাফীদের মতে, মোহরের সর্বনিম্ন সীমা ১০ দিরহাম। এর প্রমাণ এ হাদীসটি- "১০ দিরহামের কমে মোহর নেই।" ইমাম শাওকানী বলেন, "যদি এই হাদীসটি সহীহ হত তাহলে তা পূর্বোল্লেখিত যেসব হাদীসে মোহরের পরিমাণ এর চেয়ে কম হতে পারে বলে নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলোর বিরোধী হত। কিন্তু এই হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। এ হাদীসে মুবাশশির বিন আবীদ ও হাজ্জাজ বিন আরতাআহ নামে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। হাজ্জাল মুদাললিস এবং মুবাশশির পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।"
২। মালেকীদের মতে, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে ১/৪ দীনার অথবা তিন দিরহাম অথবা সমমূল্যের ব্যবসায়ী পণ্য।
৩। শাফেঈ ও হাম্বলীদের মতে, মোহরের কোন সর্বনিম্ন সীমা নেই। তাদের মতে, যে জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহর হিসেবে গণ্য হতে পারে। আর যে জিনিস মূল্যহীন তা মোহর হতে পারে না। ইমাম শাওকানী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়,মোহরের সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। তা কমও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। পারস্পরিক সমঝোতা এবং সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে মোহর কম-বেশী হতে পারে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বলেন, "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোহরের এমন নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেননি যার কম বা বেশি মোহর নির্ধারণ করা চলবে না। কারণ এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ প্রকাশ করার রেওয়াজ ও অভিরুচি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাছাড়া চাহিদার ক্ষেত্রেও লোকদের স্তর রয়েছে। এজন্য তাদের জন্য মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। যেমন কাঙ্খিত পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যা আদায় করার জন্য প্রয়াস চালাতে হয় এবং তার একটা মূল্য থাকে। আর এমন পরিমাণ হওয়া উচিত নয় যা সাধারণত লোকদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আদায় করা কষ্টসাধ্য হবে। এটাই মোহরের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে রীতি রয়েছে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল আজকাল অনেকে বিবাহের মোহরানার মত ফরজ কাজকে মর্যাদার বিষয় বা তালাক থেকে রক্ষার জন্য নারীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এ যেন ছেলের সামর্থ্যের দিকে খেয়াল না করে মেয়ে পক্ষ তাদের বংশ মর্যাদা

অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করেন। আবার অনেকের ধারণা যে, বিবাহে মোহর বেশি ধার্য করা থাকলে ছেলে পক্ষ মেয়েকে তালাক দিতে পারবে না কিংবা তালাক দিতে চাইলে প্রচুর টাকা দিতে হবে। এ উভয় ধারণা ইসলাম বিরোধী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকেরা এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন। এছাড়া কিছু না থাকায় কেবল কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে বিবাহ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কারণবশত মোহর বাকি রাখা যায়।তবে সেটা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই যত দ্রুত সম্ভব তা পরিশোধ করা কর্তব্য। মোহর বাকি থাকলে সন্তান অবৈধ হবে এ কথা ঠিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাজি? সে বললো,হ্যাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বললেন,অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাজি? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর ধারণ করলে না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ওই ব্যক্তি হুদাইবিয়াবিয়ার অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। এ সময় তার মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি আমার খায়বরের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসেবে দান করলাম । যার মূল্য ছিল ১ লক্ষ দিরহাম. (আবু দাঊদ হা/২১১৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম একদা মোহর বাকি রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তারা আদায় করতে বলেন। তবে মোহরানা পরিশোধ না করে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেওয়ার যে রীতি সমাজে চালু আছে তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং হাতে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে।

১৫. আড়ম্বর ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করা: বিয়েতে আড়ম্বর হলো অতিরিক্ত অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করা, যা অনেক সময় সামাজিক চাপের সৃষ্টি করে। অপরদিকে, কুসংস্কার হলো এমন কিছু অন্ধবিশ্বাস বা প্রথা যার কোনো যৌক্তিক বা ধর্মীয় ভিত্তি নেই, তবে ভাগ্য ভালো বা খারাপ হওয়ার ভয়ে মানুষ এগুলো মেনে চলে।

নিম্নে সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত প্রধান আড়ম্বর এবং কুসংস্কারগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

ক) বিবাহের তারিখ নির্ধারণ : বছরের নির্দিষ্ট কোন মাস বা দিনকে শুভ বা কল্যানকর মনে করে সেই মাস বা দিনকে বিবাহের জন্য নির্ধারণ করা অথবা কোন মাস বা দিনকে অশুভ বা অকল্যাণকর মনে করে বিবাহ -শাদী থেকে বিরত থাকা হলো শরীয়ত বিরোধী কাজ। এরকম বিশ্বাস থেকে অবশ্যই আমাদের বিরত থাকতে হবে। কেননা নির্দিষ্ট কোন দিনে কারো মৃত্যু বা জন্মদিনে বিবাহ করা যাবে না মনে করা গুনাহের কাজ। কেননা বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ,প্রতিটি মাস একই। মানুষ যে যার সুবিধা অনুযায়ী যে কোনদিন নির্ধারণ করে বিবাহ - শাদী করতে পারবে।

খ) যৌতুক আদান-প্রদান: ইসলামের নিয়ম,মেয়েকে মোহরানা দেওয়া হবে কিন্তু আমরা এখন উল্টোটা দেখতে পাই। মোহরানা যত ধার্য করা হয় তা কিছুই দেয়া হয়না বা কিছু দিয়ে সবটুকু বাকিতে রেখে মৃত্যুর সময় মাফ চেয়ে নেয় অথবা অনেকে পরিশোধ করে। কিন্তু আজকাল আমরা দেখতে পাই যৌতুক মহামারী আকারে ছড়িয়ে গেছে। ছেলে কত দামী তা নির্ধারণ করা হয় যৌতুক দিয়ে। যত বেশি যৌতুক তত বেশি ছেলের সম্মান। মেয়ে বাবার বাসা থেকে যত বেশি টাকা-পয়সা,সোনাদানা,ফার্নিচার নিয়ে আসবে ততই মেয়েকে ভালোবাসা হবে। এভাবে মেয়েকে দিতে গিয়ে অনেক বাবা নি:স্ব হয়ে যান। ঋণে জর্জরিত হয়ে যান। ছেলে পক্ষ অনেকে ভাবে,যৌতুকের টাকা পয়সা দিয়ে ছেলে উন্নতি করবে,টাকা না নিয়ে আসলে বউকে খাওয়াবে কিভাবে ইত্যাদি। এভাবে অস্বচ্ছলতার দোহাই দিয়ে কিংবা স্বাবলম্বী হওয়ার নাম করে মেয়ের পিতা বা অভিভাবকের নিকট থেকে যৌতুক গ্রহণ করা হারাম।

আল্লাহ বলেন, তোমরা অন্যায় ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। (সুরা নিসা :আয়াত ২৯)

কারো সক্ষমতা না থাকলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা জরুরী আল্লাহ বলেন, যাদের বিয়ের সামর্থ নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। (সুরা নূর, আয়াত ৩৩)

আর কেউ নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুতা বজায় রাখার জন্য বিবাহ করার নিয়ত করলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ৩ প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব। চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে ; বিবাহে আগ্রহী লোক, যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী। (নাসাঈ হা/৩১৬৬;তিরমিযী হা/১৬৫৫)

সুতরাং যেকোনো কারণেই হোক না কেন যৌতুক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে যৌতুক প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে কেননা এতে পাপের কাজের সহযোগিতা করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (সুরা মায়েদাহ : আয়াত ২)

গ) এঙ্গেজমেন্ট বা আংটি পরানো : আজকাল মুসলমানদের অধিকাংশ বিবাহে আংটি পড়ানোর রীতি চালু আছে। যেখানে বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়ি গিয়ে তাকে আংটি পরায় বা আংটি আদান - প্রদান করায় এবং এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন আড়ম্বর পূর্ণ আনুষ্ঠানের। ফটো সেশন করা হয়, চলে নারী - পুরুষের অভাব মেলামেশা। সমাজে এঙ্গেজমেন্ট, বাগদান বা পান-চিনি অনুষ্ঠান নামে যা করা হচ্ছে তার শরীয়তসম্মত নয়। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ) একে কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। (আদাবুয যিফাফ,মাসআলা নং ৩৮)

ঘ)থুবড়া ও ক্ষীর খাওয়ানো: বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বর ও কনেকে বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে নিজ নিজ বাড়িতে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে রাতের প্রথম অংশে মাহরাম, গায়রে মাহরাম পুরুষ - নারী, যুবক-যুবতী সকলে মিষ্টি, ফলমূল ও পিঠা-পায়েস ইত্যাদি মুখে তুলে খাওয়ায়। সেই সাথে নব যুবতীরা গান গেয়ে টাকা পয়সা আদায় করে। এসব প্রথা শরীয়তসম্মত নয়। বরং এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। আর পর্দাহীন ভাবে চলাফেরা ও হাসিঠাট্টা থেকে যুবক- যুবতী তারা যেনার দিকে ধাবিত হয়।

ঙ) গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদের নামে আমাদের সমাজে বিবাহের দু একদিন পূর্বে বরকে কনের পক্ষের যুবতী নারীরা এবং বরের ভাবী, চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো

বোন, খালাতো বোনেরা মিলে হলুদ মাখায় । অনুরূপভাবে কনেকে বরের পক্ষের লোকেরা ও তার চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই সহ অন্যান্য গায়রে মাহারাম পুরুষরা যেভাবে হলুদ মাখায় তা ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সামাজিক প্রথা মতে গায়ে হলুদের ব্যবহৃত পোশাক, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি বর-কনে সাধারণত আর ব্যবহার করবে না। এছাড়া এই হলুদ মাখানোর জন্য উভয় বাড়িতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়। এসব শরিয়াতসম্মত নয়। তবে বর নিজে বা কোন পুরুষ ও মাহরাম মহিলা যদি হলুদ মাখিয়ে দেয় তাতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে কনে নিজে বা মহিলারা কিংবা কোন মাহরাম ব্যক্তি কনেকে শালীনভাবে হলুদ মাখিয়ে দিতে পারে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে বললেন, এটা কিসের রঙ? তিনি বলেন আমি একটি মেয়েকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার এই বিয়েতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা করো। (বুখারী হা/৫০৭২); মুসলিম হা/ ১৪২৭)।

এছাড়াও বর্তমানে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আরেকটি অনুষ্ঠান জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে বরের পক্ষের লোকেরা কনে কে মেহেদি রাঙাতে আসে সারম্বরে। এটাও শরীয়তসম্মত নয়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিয়েতে যত অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে আকদ বা বিবাহ এবং ওয়ালিমা ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠান শরীয়ত সম্মত নয়।

চ) বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা : আমাদের সমাজে বিয়ে মানে অশ্লীল গান-বাজনা। বিয়ের অনুষ্ঠানে বাংলা,ইংরেজি,হিন্দি বিভিন্ন অশ্লীল গান -বাজনা ছাড়া যেনো বিয়ে হবেইনা। বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এসব অশ্লীলতা চলে। এছাড়া এসব গানের তালে তালে বাচ্চারা, যুবক-যুবতী,বৃদ্ধা মহিলারা এমনকি বর -কনেও বাদ যায়না। এখনতো বন্ধু-বান্ধব সাথে নিয়ে বর-কনে একসাথে নাচানাচি করে। অথচ ইসলামে এই অশ্লীল গান - বাজনাকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু সম্প্রদায় হবে যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড় মদ ও বাদ্যযন্ত্র কে হালাল মনে করবে। (বুখারী হা/৫৫৯০)

অন্যত্র তিনি বলেন, আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ,জুয়া ও তবলা। (আবুদাউদ হা/৩৬৯৬) উল্লেখ্য বিবাহের ঘোষণার জন্য দফ বা এক মুখো ঢোল বাজানো বৈধ। (আদাবুয যিফাফ,মাসআলাহ নং ৩৭)

ছ) মহিলা বরযাত্রী : পর্দা করা মহিলাদের জন্য ফরজ। অথচ বিয়ের অনুষ্ঠান বেপর্দার সয়লাব। কে কত বেপর্দা হয়ে সুন্দর ভাবে সাজগোজ করতে পারে এই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলে। কে কত দামী আকর্ষণীয় পোশাক পরল, কত ভরি গহনা পরলো এসবই মূখ্য হয়ে উঠে। অর্থাৎ নিজেকে যতটা আকর্ষণীয় ভাবে ফুটিয়ে তোলা যয ততই যেন বাহবা পাওয়া যায়। বর ও কনের বাড়ির উভয় পক্ষের লোকেরই একই হালত। দিন যত যাচ্ছে খোলামেলা পোশাকের চাহিদা তত বাড়ছে। বিয়ে বাড়ি সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে খোলামেলা পোশাকের চাহিদা যেনো আরো বেড়ে যায়। খোলামেলা পোশাক পরে বরযাত্রী হয়ে মাহরাম-গায়রে মাহরাম একই গাড়িতে যায়। গাড়িতে বাজে অশ্লীল গান-বাজনা এবং বর যাত্রীদের হাসি-তামাশা। এটি শরীয়তসম্মত নয়। এমনকি অনেক পর্দানশীল মা-বোনেরাও বোরখাকে বিসর্জন দিয়ে নামমাত্র পর্দা করে। যা খুবি দৃষ্টিকটু।যদি একান্তই যেতেই হয় তবে পর্দার সহিত শালীনভাবে যাবে।

জ) সাজসজ্জা করা : বর্তমানে বিয়ে মানে ভারী মেকআপ, বেপর্দা এবং হারাম সাজগোজ। বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীকে বিভিন্নভাবে সাজানোর প্রথা চালু আছে। বিউটি পার্লারে নিয়ে গিয়ে কনেকে সাজানো হয়। বিভিন্ন স্টাইল করে চুল কেটে, মেকাপ দিয়ে মুখ মন্ডলসহ সর্বাঙ্গ সাজানো হয়। যাতে খরচ হয় হাজার হাজার এমনকি লক্ষ টাকা। অনেকে মেকাপ নষ্টের ভয়ে সালাত ত্যাগ করে। অথচ সালাত আদায় করা ফরজ। এসব সাজসজ্জা বলা যায় বাড়াবাড়ি। তবে স্বাভাবিক সাজসজ্জা নিন্দনীয় নয়। তবে সাজজ্জাও হবে গৃহের ভিতরে। যেনো কোনো গায়রে মাহরাম দেখতে না পান। কিন্তু আমরা উল্টোটা দেখি। সাজসজ্জা করে বর-কনে ও তাদের বন্ধুবান্ধব,আত্নীয়সজনের মাঝে হাসি-তামাশা চলে। যা শরীয়তসম্মত নয়। এসবের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি হবে যদি তাওবা করে ফিরে না আসে। আবার বিয়েতে

বরকে স্বর্নের আংটি বা চেইন না দিলে যেনো বরের সম্মানই হয়না। অথচ পুরুষের জন্য স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। এছাড়া নেইল পলিশ,কপালে টিপ,নখ বড় ইত্যাদি কাজ করে। যা বিধর্মীদের আচরণ। যা পরিহার করা জরুরি। কেনোনা রাসুল (সা.) বলেছেন,যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করবে,সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। (আহমাদ,আবুদাউদ হা/ ৪০৩১)। এছাড়াও মহিলারা ভ্রু উঠায় এবং পরচুলা লাগায় যা স্পষ্টত হারাম।

ঝ) অপচয় ও অপব্যয় করা : ইসলাম বলে তুমি মিত্যব্যায়ী হও অপব্যয়ী হইও না। ইসলাম বলে তুমি প্রয়োজনমতো খরচ করো কিন্তু অপচয় করো না। কিন্তু আজকাল আমরা বিবাহের অনুষ্ঠানে এর উল্টোটা দেখতে পাই। দাওয়াতের জন্য দামি কার্ড ছাপানো,ব্যবহারের জন্য বাহারি মূল্যবান পোশাক ক্রয় করা, আতশবাজি ফুটানো, বর-কনের বাড়িতে বিবাহের আগে পরে আলোকসজ্জা করা, রঙ ছিটা- ছিটি, অপরিমিত খাদ্য -খাবারের ব্যবস্থা করা, যার অধিকাংশই নষ্ট হয় ইত্যাদি । অনেকে ঋণ করেও এসব করে থাকে। এমনকি ব্যাংকিং লোন করে এসব করে। অনেকে তো আবার সুদের উপর টাকা নিয়ে এসব অনুষ্ঠান করে। অথচ ইসলামে সুদ হারাম।

আল্লাহ বলেন, আর তোমরা খাও ও পান কর, অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা আ'রাফ : আয়াত ৩১) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সুরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৭)।

ঞ) আড়ম্বর পরিহার করা : বর্তমানে বিবাহ উপলক্ষে বর-কনে উভয় পক্ষ প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিভিন্ন খরচ করে থাকে। স্ব স্ব মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে থাকেন। উভয়পক্ষ নিজেদের বংশ গৌরব ও আভিজাত্য রক্ষা করতে গিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলে। এটা একদিকে লৌকিকতা ও অপরদিকে তাকওয়া পরিপন্থী । বিবাহ যে একটি ইবাদত, আরম্বড় ও অন্যান্য অনর্থক কর্মকাণ্ডের কারণে এই মূল বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। তাই

এসব পরিহার করে মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠান শরীয়তসম্মত পন্থায় সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা এসব বিবাহে আল্লাহর রহমতে ও বরকত থাকে না। উত্তম বিবাহ হচ্ছে যা সহজে সম্পন্ন হয়। (আবুদাউদ হা/২১১৭)।

ট) ফটো সেশন ও ভিডিও রেকর্ডিং : আজকাল আমাদের সমাজে বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে স্থির ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে বর কনে ও অন্যান্য অতিথিদের ছবি ধারণ করা হয়। এসব অন্যকে দেখানোর জন্য কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। তাদের কাছে এসব স্মৃতি ও ইতিহাসের সাক্ষী। ছবি উঠানোর জন্য ক্যামেরাম্যানের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকে। তার জন্য সাত খুন মাফ। ছবি তোলার জন্য নারী-পুরুষ একত্রে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দেয়। নানা ভঙ্গিমায় নারীরা ছবি তোলে অপরদিকে ভিডিও করা হয় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সবকিছুর। এমনকি বাসর ঘরে বিছানার উপর বসা বর-কনের ছবিও তোলা হয়। এসব অনর্থক ও বিধর্মীদের অনুকরণ বৈ কিছুই নয়।

ঠ) অমুসলিমদের প্রথার অনুসরণ : বিবাহের অনুষ্ঠানে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদী, হলুদ, কিছু ধান, দুর্বা ঘাস, কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নিয়ে চাটিতে তৈল দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তারপর বর কনের কপালে তিনবার হলুদ মাখায়। মূর্তি পূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো, বর-কনের মুখে আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়া - দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় বর-কনেকে গোসল করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপরে বড় চাদরের চারকোনা চারজন ধরে নিয়ে যায়। বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিঁড়িতে বসিয়ে বা শিল - পাটায় দাঁড় করিয়ে দুধভাত খাওয়ানো হয়। সম্মানের নামে বড় কনে মুরব্বিদের কদমবুসি করে। এছাড়া বিবাহের পর বর দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম করে। এসব প্রথা ইসলামই নেই।

ড) বিবাহের বয়স নির্ধারণ : আমাদের দেশে নারী-পুরুষের বিবাহের জন্য বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ বয়সের পূর্বে কেউ বিবাহ করতে পারবে না,করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইন শরীয়ত বিরোধী। ইসলাম প্রত্যেক

প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম ও সামর্থ্যবান নারী- পুরুষকে তাদের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার জন্য বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে।(বুখারী হা/ ৫০৬৫)।

এছাড়া নবী করিম সাঃ যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর এবং যখন বাসর যাপন করেন তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। আর তিনি ৯ বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে জীবন কাটান।(বুখারী হা/৫১৫৮)।

বিবাহ পরবর্তী স্বামীর করণীয়

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু করণীয় রয়েছে। যার মাধ্যমে একটি সুখী ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। স্বামীর করণীয় এর পাশাপাশি অন্য মানুষের জন্য যেসকল করনীয় আছে সেগুলোও এখানে উল্লেখ করা হলো ইনশাল্লাহ। নিম্নে করণীয় ও দায়িত্ব উল্লেখ করা হলো -

বিবাহ পরবর্তী অন্য মানুষের করণীয়-

ক) বিবাহ শেষে দোয়া পাঠ :বিবাহ সু-সম্পন্ন হওয়ার পর উপস্থিত সকলে বর-কনের কল্যাণের জন্য এই দোয়া পাঠ করবে - بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ।আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত করুন। (আবুদাউদ হা/২১৩০) অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে আন্তরিক সুখ ও মানসিক প্রশান্তি দান করেন আর এ বিবাহের মাধ্যমে সে প্রশান্তি অর্জিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন, যাতে স্বামীরা স্বীয় স্ত্রীর নিকটে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। (আব্দুল মুহসিন আল - আব্বাদ, শরহ সুনানে আবী দাউদ,১২/৯৫)

খ) বাসর ঘর ও কনে সাজানো: বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রীর নতুন দাম্পত্য জিবনের সূচনা হিসেবে বাসর ঘর সাজানো এবং কনেকে স্বামীর জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া সুন্নাত।(বুখারী হা/৩৮৯৪)। হাদিসের কিতাব থেকে দেখতে পাই,উম্মু ছুলাইম (রা) সাফিয়া (রা) কে রাসূলের জন্য সাজিয়ে দিয়েছিলেন।(বুখারী হা/৩৭১) এবং আয়িশা (রা) কেও রাসুল (সা) এর জন্য সাজানো হয়েছিলো।এ বিষয়ে আয়িশা (রা) নিজেই বলেছেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করেন তখন আমার বয়স ছিল ৬ বছর। তারপর আমরা মদিনায় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জোরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। যখন আমার মাথার সামনে চুল জমে উঠলো আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান উচ্চৈ:স্বরে আমাকে ডাকলেন। আমি তার কাছে এলাম। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। তখন আমি হাফাচ্ছিলাম। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হলো। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখ মণ্ডল ও মাথা মাসাহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসার মহিলা ছিলেন। তারা বললেন কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমন্ডিত হোক। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তারা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিলেন। সে সময় আমি ছিলাম নয় বছরের বালিকা। (বুখারী হা/ ৩৮৯৪)

গ) বিবাহের ঘোষণা দেওয়া : বিবাহ কোনো গোপন বিষয় না। এটি একটি প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই বিনা কারণে বিয়েকে গোপন রাখা উচিত নয়। বরং সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে সকলকে জানিয়ে দেয়া উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বিবাহের ব্যাপক প্রচার করো।(আহমাদ হা/১৬১৭৫)। এজন্য বিবাহের সময় ইসলামে দফ বা একমুখা ঢোল বাজানোকে জায়েজ বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সমাজে উল্টো দেখতে পাই। আমাদের সমাজে কারো বিয়ে হলে বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকে হারাম গান-বাজনা বাজানো হয়। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ কাজ। রুবাই বিনত মুআব্বিস ইবনু আফরা (রাঃ) হাতে বর্ণিত। তিনি

বললেন, আমার বাসর রাতের পরের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং আমার বিছানার উপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার বিছানার উপর বসে আছো। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিলো এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমাদের বাপ - চাচাদের শোকগাঁথা হচ্ছিল।

বিবাহ পরবর্তী স্বামীর করণীয় :

ক) বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করা: প্রত্যেক মানুষেরই উচিত অন্য মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করা। সেই মানুষটি যদি হয় নিজের অর্ধাঙ্গিনি তাহলে সদয়ের মাত্রা কতখানি হবে নিজেরাই একটু ভেবে দেখি। বাসর রাতে নববধূর নিকটে প্রবেশ করে তার সাথে সদয় ও সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, বিশেষত কম বয়সী স্ত্রীদের সাথে। আসমা বিনতু ইয়াজিদ বিন সাকান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আয়েশাকে তেল মাখিয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। তারপর তাকে খোলা অবস্থায় দেখার জন্য আহ্বান করলাম। তিনি এসে আয়েশার পাশে বসলেন। তারপর দুধের একটি বাটি নিয়ে আসা হলো। তিনি পান করে আয়েশার দিকে দিলেন। কিন্তু আয়েশা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন। আসমা বলেন, আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, তুমি নবী করীম (সা.) এর হাত থেকে গ্রহণ কর। আসমা বললেন, সে নিয়ে কিছুটা পান করল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি কি তোমার বান্ধবীকে দিব? আসমা বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! বরং তা আপনি নিন এবং পান করে আপনার হাত থেকে আমাকে দিন। তিনি নিয়ে পান করে আমাকে দিলেন। তিনি বলেন, আমি বসে পাত্রটি আমার জানুর উপরে রাখলাম। এরপর পাত্রটি ঘুরাতে লাগলাম এবং ঠোট দ্বারা স্পর্শ করতে লাগলাম যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পান করার স্পর্শ পাই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন তাদেরকে দাও। তারা বললেন, আমরা তা পান করার ইচ্ছা করি না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা জমা করে না। (মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৬৩২)

খ) স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে দোয়া করা : বাসর রাতে স্ত্রীর মাথায় বা কপালে হাত রেখে স্বামীর জন্য দোয়া পড়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে নববধূর সাথে একান্ত সাক্ষাতের শুরুতে বা বাসর ঘরে প্রবেশের পর প্রথম সুযোগেই এই দোয়া পড়া সুন্নত। সাধারণত একত্রে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায়ের পর বা সাক্ষাতের পরপরই এটি পড়া উত্তম। এই দুয়া মূলত বরকতের দুয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে সে যেন তার কপালে হাত রেখে বিসমিল্লাহ পড়ে অতঃপর বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকা মিন খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'উজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা 'আলাইহি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তার কল্যাণ এবং তার মাঝে যে স্বভাব বা প্রকৃতি আপনি সৃষ্টি করেছেন তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তার অনিষ্ট থেকে এবং তার মাঝে যে স্বভাব আপনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। (আবুদাউদ হা/২১৬০)

গ) স্বামী- স্ত্রীর একত্রে সালাত আদায় করা: বাসর রাতে নববধূর সাথে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করা একটি মুস্তাহাব বা উত্তম আমল। রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সরাসরি কোনো হাদিস না থাকলেও সাহাবিদের আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত। শাকীক (রা.) বলেন, আবু হারীয নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি একজন যুবতী কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। আর আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং রাগ-অসন্তুষ্টি শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তাতে সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সে(তোমার স্ত্রী) যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাকে তোমার পিছনে দুই রাকাত সালাত পড়তে নির্দেশ দিবে।

(মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ; আলবানী,আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে গেলে স্বামী দাঁড়িয়ে যাবে এবং তার পিছনে দাঁড়াবে। অত:পর তারা একসঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে এবং বলবে,

اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم و ارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير امين يارب .

হে আল্লাহ! আমার পরিবারে আমাকে বরকত দিন এবং আমার মধ্যে তাদের জন্য বরকত দিন। আল্লাহ আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযিক দিন এবং আমার থেকে তাদেরকেও রিজিক দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্রে রাখুন আর আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে কল্যানের দিকেই বিচ্ছেদ ঘটান ।(তাবারানী,মু'জামুল কাবীর,হা/৮৯০০০)

ঘ) সহবাস সম্পর্কিত কিছু করণীয়: ইসলাম প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। একটি দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতেও ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অন্যতম একটা অংশ হলো স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণ (সহবাস)। প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিধি থাকে জায়েজ -নাজায়েজ হওয়ার। নিম্নে স্বামী স্ত্রীর এ বিষয়ে করণীয় গুলো তুলে ধরা হল-

স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি ইবাদত । যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

হযরত আবু যর রাযি থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي، ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ " أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْر. " ٌ

কিছু সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা

রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।
সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন করে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে? তিনি বললেন, কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে। (সহীহ মুসলিম ২৩৭৬)

স্বামী স্ত্রী উভয়ের শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী সহবাস করতে পারবে।
কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই।
তবে এক্ষেত্রে চার মাসের অধিক বিরতি দেওয়া ঠিক নয়।

,
ইসলামী স্কলারগন বলেছেনঃ
স্ত্রী সহবাসের সময় যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিতঃ-

নিয়ত খালেস করে নেয়া। অর্থাৎ, কাজটির মাধ্যমে নিজেকে হারাম পথ থেকে বিরত রাখার, মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধি করার এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়ত করা।

সহবাসের সময় ফোরপ্লে তথা চুম্বন, আলিঙ্গন, মর্দন ইত্যাদি করা। হাদিসে এসেছে,
كان رسول الله ﷺ يُلاعبُ أهله ، ويُقَبلُها

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি করতেন। (যাদুল মা'আদ ৪/২৫৩)

সহবাসের শুরু করার সময় দোয়া পড়া–
بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

‘আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে তুমি যা দান করবে (মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে) তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এরপরে যদি তাদের দু’জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ৪৭৮৭)

যেকোনো আসনে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ইসলামে আছে। মুজাহিদ রহ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ ْلَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُم (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমণ কর।)

এই আয়াতের তফসিরে বলেন, ِقَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ ‘দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়, সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে (সঙ্গম করতে পারো, তবে তা হতে হবে) স্ত্রীর যোনিপথে।’ (দুররে মানছুর ১/২৬৫ তাফসীর তাবারী ২/৩৮৭-৩৮৮ মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২)

মলদ্বারে সহবাস হারাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
لا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ্ তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকান না। (ইবন মাজাহ ১৯২৩)

হায়েজ অবস্থায় সহবাস হারাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যাক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহর কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো। (তিরমিযী ১৩৫ আবূ দাঊদ ৩৯০৪)

একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে অজু করে নেয়া মুস্তাহাব। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًافإنه أنشط للعود

যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর আবার সহবাস করতে চায় তখন সে যেন এর মাঝখানে ওযু করে নেয়। কেননা, এটি দ্বিতীয়বারের জন্য অধিক প্রশান্তিদায়ক। (মুসলিম ৩০৮ হাকিম ১/২৫৪)

তবে গোসল করে নেয়া আরো উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ এরূপ করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও উৎকৃষ্ট। (আবু দাউদ ২১৯)

বাসর পরবর্তী সকালে করণীয় :

ওয়ালীমা করা : শরীয়তের বিধান হলো বিবাহের পর ওলিমা করা সুন্নাত।

রুখছতির পর (বাসর রাতের পর) তিন দিনের মধ্যে যেকোনো এক দিন ওলিমা করা সুন্নাত।

(নাজমুল ফাতওয়া ৫/২)

রুখছতি (বাসর রাত) এর পূর্বে ওলিমা করলে সময়ের সুন্নাত আদায় হবেনা।

(নাজমুল ফাতওয়া ৫/৩)

তবে ওলিমার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

(ফাতাওয়ায়ে উসমানী ২/৪০৭)

মহিলার সাথে একাকি নির্জনে অবস্থান করার পর ওলিমা করলেও ওলিমার করার সেই সুন্নত সময়,সেই সময়েই ওলিমা আদায় হয়ে যাবে।

ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছে

(فإن الدخول يشمل الخلوة أيضًا؛ لأنها دخول حكمًا. (شامي ٢٣٦،٤ زكريا

যার সারমর্ম হলো খুলওয়াতে ছহিহাহও সহবাসের হুকুমেই।

,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْيَمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ صحيح

আনাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাযি.)-এর শরীরে জা‘ফরানের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তাকে কি পরিমাণ মোহর প্রদান করেছো? তিনি বলেন, খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বিবাহভোজের আয়োজন করো, যদিও তা একটি বকরী দ্বারাও হয়। (আবু দাউদ ২১০৯)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ صحيح

সাবিত (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাইনাব বিনতু জাহশের বিবাহের ঘটনা আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকট আলাপ করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইনাবের বিয়েতে যেভাবে ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করেছেন অন্য কোনো স্ত্রীর বেলায় তাঁকে তদ্রূপ করতে দেখেনি। তিনি একটি বকরী দিয়ে বিবাহ ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন।
(আবু দাউদ ৩৭৪৩)

,
বাসর রাতের পরদিন ওয়ালিমা করা সুন্নাত। হাদিসে এসেছে,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) এর সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করার পর ওয়ালিমা করেছিলেন। (বুখারী:৫১৭০)
তবে তিন দিন পর্যন্তও বিলম্বিত করা যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাফিয়া (রাঃ) কে বিবাহের পর তিন দিন পর্যন্ত ওয়ালিমা খাইয়ে ছিলেন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা:৩৮৩৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ - رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ - زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ، وَقَالَ: أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ ضعيف، الإرواء

.

আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান আস সাকাফী (রহঃ) থেকে তার গোত্রের এক অন্ধ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ওয়ালীমা অনুষ্ঠান বিবাহের প্রথম দিনে করা জরূরী, দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উত্তম এবং তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান লোক শুনানো ও লোক দেখানোর জন্য। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ)-কে ওয়ালীমাতে প্রথম দিন দা'ওয়াত দেয়া হলে তিনি সাড়া দিলেন, দ্বিতীয় দিন দা'ওয়াত দেয়া হলেও কবূল করলেন এবং তৃতীয় দিন দা'ওয়াত দেয়া হলে তিনি দা'ওয়াত কবূল করলেন না। তিনি বললেন, এ সব লোক মানুষকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য এসব করে থাকে।
(আবু দাউদ ৩৭৪৫)

,
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا - أَىْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ " . قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاء. ِ

মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (রহঃ) ..... বনূ ছাকীফের জনৈক কানা ব্যক্তি, যাকে তার সদাচারের জন্য মারুফ বলা হতো, যদি তার নাম যুহায়র ইবন উসমান না হয়, তবে আমি জানি না তার সঠিক নাম কি! তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিবাহের প্রথম দিনে ওলীমার ব্যবস্থা করা জরুরী, দ্বিতীয় দিনে উত্তম এবং তৃতীয় দিনে করলে তা নাম প্রচার ও লোক দেখানোর জন্য করা হচ্ছে বলে বিবেচিত হবে।
(আবু দাউদ ৩৭০৬)

,

عمدة القارى (৪/৮৮): ومنها أن فيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس وأنها بعد الدخول وقال الثوري ويجوز قبله وبعده والمشهور عندنا أنها سنة وقيل واجبة وعندنا إجابة الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرها... والوليمة عبارة عن الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة خاصة بطعام العرس لأنه طعام الزفاف والوكيرة طعام البناء ... ويستجب لأصحاب الزوج وجيرانه

ওলিমা বাসত রাতের পর হবে,তবে কিছু উলামায়ে কেরামগন বলেছেন যে বাসর রাতের আগেও ওলিমা খাওয়ানো জায়েজ আছে।

,

وفى الموسوعة الفقهية (৪৫/২৪৯)ثانيا : وقت الوليمة :- اختلف الفقهاء في وقت الوليمة :فذهب الحنفية والمالكية في المشهور وابن تيمية إلى أن الوليمة تكون بعد الدخول ... ويرى بعض الحنفية أن وليمة العرس تكون عند العقد وعند الدخول...وصرح الحنفية بأنه إذا بنى الرجل بامرأته ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما، وإذا اتخذ وليمة ينبغي لهم أن يجيبوا، ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة

ওলিমা বাসর রাতের পরেই খিলাইতে হবে।

কিছু কিছু হানাফী উলামায়ে কেরামগন বলেছেন যে বিবাহ পড়ানোর সময়েও ওলিমা হবে।

قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل: عند العقد، وقيل: عندهما. والمختار أنه على قدر حال الزوج. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح / باب الوليمة(৩৪৫,

মুখতার কওল হলো স্বামীর অবস্থার উপর এটা নির্ভর করবে।

ওয়ালিমা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় : সমাজে ওয়ালিমার নামে বড়লোকদের মিলন মেলা বসে সেখানে বরের বা অভিভাবকদের লক্ষ্য থাকে উপহারের দিকে। এই উপহার নেয়ার জন্য চেয়ার টেবিল নিয়ে বসা হয়। যা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। এভাবে উপহার নেয়া জায়েজ হবে না। এভাবে উপহার নেয়া বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা রাযি থেকে বর্ণিত

عن أمِّ المؤمنين أم عبدالله عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ))؛ [رواه البخاري ومسلم]، وفي رواية لمسلم: ((من عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَد.((ُّ

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,দ্বীনে ইসলামে পূর্বে ছিলনা,এমন কোনো জিনিষকে পরবর্তীতে ঢোকানো হলে,সেটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এবং কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে যা দ্বীনে ইসলামে পূর্বে ছিল না,তাহলে সেই কাজ পরিত্যাজ্য। (বেখারী-মুসলিম)

ওয়ালিমা সুন্নাত হল সৎ ব্যক্তিগণকে দাওয়াত দেওয়া। তারা দাওয়াত গ্রহণ করে ওয়ালিমাতে আসবেন এবং নবদম্পতির মঙ্গলের জন্য দোয়া করবেন। বেছে বেছে কেবল বড়লোকদের ওয়ালিমায় দাওয়াত দেওয়া হলে ওই খাদ্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট বলেছেন।

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলতেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো সেই ওলীমার (বিয়ের) খাবার, যাতে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরিবদের বাদ দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না (বা উপস্থিত হয় না), সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করল।" (সহিহ বুখারী হা/৫১৭৭)

ওয়ালিমার দাওয়াত দিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের কাউকে ওয়ালিমার (দাওয়াত) দেওয়া হলে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে।"(বুখারী হা/৫১৭৩)

ওয়ালিমার অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য লোকেরা সাহায্য করতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিয়ের পর যে ওয়ালিমা হয়েছিল সেখানে সাহাবীগন যার কাছে যেটা ছিল সেটা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ালীমা সাহায্য করেছেন। (বুখারী হা/৩৭১)

বিবাহ পরবর্তী কিছু কু-প্রথা :

১) বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরকে দাঁড় করিয়ে সালাম দেওয়া।

২) বড় ও কনের মুরুব্বিদের কদমবুসি করা। শুধু বিবাহ নয় যেকোনো সময় মুরব্বিদের কদমবুসি করা জায়েজ নয়। এটি একটি হিন্দুয়ানী প্রথা। এরকম করা কোন মুমিনের জন্য কাম্য নয়।

৩) বরকে কনের সকল মাহরাম ও গায়রে মাহরাম মহিলাদের সাথে পর্দা বিহীন সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ।

৪) কনেকে কোন গায়রে মাহরাম দেখা এবং উপহার উপঢৌকন দেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

৫) বরের সাথে কনের বাড়ির গায়ের মাহরাম প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও মহিলাদের হাসি তামাশা করা হারাম তেমনি ভাবে কনের সাথে বরের বাড়ি গায়রে মাহরাম পুরুষদের হাসি তামাশা করা হারাম।

৬) সমাজে বিবাহোত্তর ওয়ালিমা না করে বিবাহের অনেকদিন পর এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের পরও বউ তুলে আনার রেওয়াজ দেখা যায়। আর এ উপলক্ষে কানের পিতার বাড়িতে আড়ম্বর পূর্ণ ভোজের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। এটা অপচয় ও বিদআতি অনুষ্ঠান। শরীয়তে এসব অনুষ্ঠানের কোন নজির পাওয়া যায় না।

বিবাহ পরবর্তী স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তাদের মূল লক্ষ্য আখেরাতের জীবন। দুনিয়ায় সুশৃঙ্খল জীবনের সাথে সাথে আখেরাতে কীভাবে তারা সফল হবে, সেজন্য তিনি তাদের দিয়েছেন বিস্তারিত পথনির্দেশ। তাই সব কাজে আখেরাতকে স্মরণ রাখা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সুতরাং নিছক জাগতিক বিষয়গুলোও সে এমনভাবে সম্পাদন করবে, যা দ্বারা সে আখেরাতে সফল হবে। এটাই শরীয়তে কাম্য এবং বিবেকের দাবি।

বিবাহের প্রসঙ্গটিও এমন। বিবাহকে শরীয়ত নিতান্তই জাগতিক বিষয় বিবেচনা করে না; বরং সেটাকে স্বামী-স্ত্রী এবং তৎপরবর্তী সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আখেরাতের সফলতার মাধ্যমও বিবেচনা করে। তাইতো একটি সফল দাম্পত্য জীবনের জন্য এবং পরিবারকে ইসলামী পরিবারে রূপান্তরের জন্য বিবাহের পর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা উচিত। একজন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা নিম্নে দেয়া হল -

১) পরিবারে ইসলামি অনুশাসন বজায় রাখা: পরিবারে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা অপরিহার্য কারণ এটি পারিবারিক শান্তি নিশ্চিত করে, পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে এবং শিশুদের আদর্শ ও নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। দ্বীনি অনুশাসন পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শৃঙ্খলিত রাখে। একটি পরিবারে যদি ইসলামী অনুশাসন না থাকে তাহলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম - ভালোবাসা, মায়া - মমতা এগুলো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। স্বামী - স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ- কলহ, সন্দেহ - সংশয়, অমিল - অশান্তি সবসময় লেগেই থাকবে। বিশেষ করে বর্তমান স্যাটেলাইট এর যুগে অপসংস্কৃতির ছয়লাবে আমাদের পারিবারিক জীবন হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। হারাম গান- বাজনা, নাটক- সিনেমায় প্রদর্শিত চিত্র এতটাই জঘন্য ও বেহায়াপনা যে আজ আমাদের পরিবারগুলো এসব দেখে নিকৃষ্ট মন মানসিকতার অধিকারী হচ্ছে। স্বামীরা ঘরে স্ত্রী রেখে অন্য নারীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে এবং স্ত্রীরা স্বামীকে রেখে তাদের আড়ালে পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে। এর জন্য দায়ী পরিবারে ইসলামী অনুশাসন না থাকা, ধর্মীয় চর্চা না হওয়া এবং ঘরে হারাম গান- বাজনা, নাটক - সিনেমা দেখা। সেই সাথে সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে আমাদের প্রত্যেকের সাথে থাকা অ্যান্ড্রয়েড

ফোন। উঠতি বয়সি যুবক-যুবতিরা অবলীলায় হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে,প্রাপ্ত বয়স্করা লীভ টুগেদারে যাচ্ছে। এগুলো বিজাতীয় কালচার। এগুলো আমাদের সন্তানরা কোথা থেকে শিখতেছে? আমাদের পরিবার থেকে,সমাজ থেকে।এরজন্য দায়ী আমরা নিজেই।।আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ফ্রি মিক্সিং পরিবেশ। আল্লাহ প্রদত্তভাবে নারী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ নারীর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু সেই নারী এবং পুরুষ যদি ধর্মীয় অনুশাসনে বড় না হয় তাহলে সে বিবাহের পূর্বে এবং পরেও হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারে। কেননা তার মানে আল্লাহর ভয় নেই। আজ আমরা অহরহ পরকীয়ার মত জঘন্য পাপ দেখতে পাই। এসবের মূল কারণ উপরিউক্ত বিষয়গুলো। তাই স্বামীরা শক্তভাবে নিজ পরিবারে ইসলামী অনুশাসন জারি রাখবে। নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নামাজ, পর্দা, সহিহ ভাবে কোরআন তেলাওয়াত এবং নৈতিক গুণাবলীর শিক্ষা দিবে। এবং তাদের ভুলগুলো সুন্দরভাবে শুধরিয়ে দেবে এবং প্রয়োজনে শাসন করবে। পরিবারকে আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না। (আহমাদ,মিশকাত হা/৬১)

২) স্ত্রীর দেখাশুনা করা : একজন স্বামীকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন বাবার আদরের সন্তানকে ঘরে এনেছেন। তিনি তার বাবার বাড়িতে অনেক আদর যত্নে বড় হয়েছেন। তারপর সেই বাবা তার মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা সকলেই একে অন্যের থেকে ভালো কিছু আশা করি। সেখানে একজন স্ত্রীর চাওয়া পাওয়া স্বামীর কাছে অবশ্যই বেশি হবে। একজন স্ত্রীর স্বামীর কাছে প্রথম চাওয়া হলো তিনি স্ত্রীর সুন্দরভাবে দেখাশোনা করবেন। মেয়েরা এটার প্রত্যাশা বেশি করে। আর একটি পরিবারের উন্নতি নিহিত এখানেই। প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হবে তেমনি ভাবে স্ত্রী ও তার স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। যেটাকে ইসলামেও অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এটাই হলো একজন মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন বিবাহিত পুরুষকে জানতে হবে কিভাবে আচরণ করলে তার স্ত্রীর চরিত্র ফেরেশতাতুল্য হয়ে ওঠে। স্ত্রীর আশা- আকাঙ্ক্ষা ও বৈধ চাহিদা অনুযায়ী স্বামীকে তার জীবন গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র ভদ্র আচরন ও ব্যবহার দ্বারা সেই স্ত্রীকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। পাশাপাশি তার ঘর সংসারের প্রতিও আগ্রহী করে তুলতে পারে

৩) স্ত্রীকে মন উজাড় করে ভালোবাসা : নারীরা হলো কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভালোবাসা ও মায়া মমতাতেই তার অস্তিত্ব। সে অন্যের নিকট ভালোবাসা কামনা করে। সে অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এই প্রবণতা তার মাঝে এত বেশি থাকে যে উপলব্ধি করে কেউ তাকে ভালোবাসে না, অতঃপর সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। সে হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে যায়। কাজেই এটা সর্বজন বিদিত যে, একজন সফল মানুষের সুখী বৈবাহিক জীবনের রহস্য স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশের মধ্যে নিহিত।

আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার স্ত্রী বিয়ের পূর্বে তার বাবা-মায়ের ভালোবাসা ও আদর যত্নে বেড়ে উঠেছে। এখন সে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার বাকি জীবন একসাথে কাটানোর জন্য সে আপনাকে বেছে নিয়েছে। সে আশা করে আপনি তার ভালোবাসা ও আবেগ অনুভূতির সকল চাহিদা করবেন। সে তার বাবা-মা ও বন্ধু বান্ধবের চেয়েও আপনার কাছে বেশি ভালোবাসা কামনা করে। সে আপনাকে প্রচন্ডরকম বিশ্বাস করেছে বলেই তার অস্তিত্ব আপনার কাছে অর্পণ করেছে। একটি সুখী প্রনয়ের রহস্য স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে লুকায়িত।

যদি আপনি তার হৃদয় জয় করতে চান, তাকে আপনার বাধ্যগত করতে চান, আপনি যদি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে চান, যদি চান স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসুক এবং আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকুক তাহলে সব সময় তাকে স্নেহ করুন এবং তার প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। স্ত্রীকে যদি স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন তাহলে সে সংসার, সন্তান, আপনিসহ সবকিছুর উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং আপনার ঘরবাড়ি অবস্থা সব সময় অগোছালো থাকবে। সে এমন একজন মানুষের জন্য কষ্ট করতে রাজি হবে না যে তাকে ভালবাসেনা। সংসার এমন একটি জায়গা যেখানে হাজবেন্ড ওয়াইফের মাঝে কোন মায়া মমতা না থাকলে তা নরক তুল্য হয়ে যায় যদিও তা সাজানো গোছানো এবং বিলাসবহুল জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ থাকে।

অশান্তির সংসারে আপনার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা স্নায়ুবৈকল্য হতে পারে। সে যদি আপনার দ্বারা সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সে অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্যতা খোজার

চেষ্টা করবে। সে আপনার প্রতি এতটাই অনাগ্রহি হয়ে উঠতে পারে সে হয়তো তালাক নেওয়ার মতো নিতে পারে। এসব কিছুর জন্য আপনি দায়ী। কেননা আপনি তাকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা সত্য যে অনেক তালাক এই ধরনের নির্দয়তার ফলস্বরূপ ও হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভালোবাসার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা, স্ত্রীর ইচ্ছার প্রতি স্বামীর উদাসীনতা, নারীর মানসিক অবস্থার গুরুত্বকে অবহেলা করা অনেক ডিভোর্সের জন্য দায়ী।

প্রতিদিনই ঘটছে বিবাহ বিচ্ছেদ। ২০২১ সালে ১১ হাজার ৯১৯ টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এরমধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চসংখ্যক তালাক কার্যকর হয়েছে যার সংখ্যা ৭২৪৫ টি। আর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪৬৭৪টি। যদিও এই সময়ে ঢাকা উত্তরে তালাকের আবেদন পড়েছে ৭৪১৬ টি। এর মধ্যে পুরুষ কর্তৃক আবেদন পড়েছে ১৭৬২ টি, স্ত্রী কর্তৃক ৪০৮১ টি। তাহলে সারাদেশে তালাকের সংখ্যা কত হবে আমরা একটু ভাবি।

তালাকের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনে স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীরা এগিয়ে। তালাকের কারণ হিসেবে বেশির ভাগই ছিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনি বনা না হওয়া। স্ত্রীর করা আবেদনে কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ভরণপোষণ না দেয়া, স্বামীর সন্দেহবাতিক মনোভাব, ঈচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করন, কাবিন না হওয়া, মাদকাসক্তি পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীর ওপর নির্যাতন যৌতুক মানসিক পীড়ন,পরকীয়া,আর্থিক সমস্যা ও ব্যক্তিত্যের সংঘাত। অন্যদিকে স্বামীরা নোটিশ উল্লেখ করেছেন পরকীয়া, আর্থিক সক্ষমতা কমে যাওয়া, বেপরোয়া জীবন যাপন, বদমেজাজ, সংসারের প্রতি উদাসীনতা, সন্তান না হওয়া, অবাধ্য হওয়া, টিকটক সহ সামাজিক মাধ্যমে অবাধ বিচরণ করা, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী না চলা সহ বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করা ষহয়েছে।

পারিবারিক ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব যেকোনো কিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান এবং এটা আল্লাহর অলৌকিক শক্তির অন্যতম নিদর্শন এবং মানবজাতির জন্য এক বিশেষ নেয়ামত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পারো এবং

তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সুরা রুম: আয়াত ২১)
আমাদের বন্ধু সে-ই যে তার স্ত্রীর প্রতি অধিক দয়াশীল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -
তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। (সুনানে তিরমিযী হা/১১৬২)
আল্লাহর নবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ত্রীর প্রতি দয়াশীল। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এ কথা বলে যে - 'আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি' তা কখনোই স্ত্রীর হৃদয় ছেড়ে যাবে না।'

আপনার স্নেহ ভালোবাসা অবশ্যই খাঁটি হতে হবে তবেই তা অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং শুধু ভালোবাসায় যথেষ্ট নয় স্নেহ ভালোবাসা প্রকাশো অত্যন্ত জরুরী। আপনি যদি কথা ও কাজে স্ত্রীর প্রতি অনুভূতি প্রকাশ করেন ;তবে যে ভালোবাসা আপনি প্রদর্শন করেছেন তা আপনার নিকটই ফিরে আসবে এবং আপনাদের প্রেমের বন্ধন আরও মজবুত হবে। তাই আপনার স্ত্রীর প্রতি খোলামেলাভাবে ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইতস্ততবোধ করবেন না। ঘরের বাইরে গেলে তাকে লিখুন,তাকে জানান যে আপনি তাকে অনেক মিস করছেন,মাঝে মাঝে তার জন্য কিছু কিনে আনুন, অফিসে থাকাকালীন তাকে ফোন দিয়ে তার খোঁজখবর নিন। এই ধরনের ভালোবাসার প্রকাশ নারীর মনে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

৪) স্ত্রীকে সম্মান করা: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখনি মধুর হয় যখন তাদের মাঝে থাকে শ্রদ্ধা,সম্মান,ভালোবাসা,বিশ্বাস। স্ত্রী আপনার জীবনের সবচেয়ে কাছের ও বিশ্বস্ত সঙ্গী। তাকে সম্মান করা কেবল একটি নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং একটি সুখকর, দীর্ঘস্থায়ী এবং শান্তিময় দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি। পারস্পরিক সম্মান পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনে। আপনার জীবনসঙ্গী হিসেবে আপনার স্ত্রী আপনার কাছে অন্যদের থেকে বেশি সম্মান পাওয়ার হকদার। তার জীবনসঙ্গী এবং সবচেয়ে ভালো বন্ধুর কাছে যত্ন পাওয়ার প্রতিটি অধিকার সে রাখে। সে আপনার এবং আপনার ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্য তাই সে আপনার কাছ থেকে তার চেষ্টা প্রচেষ্টার মূল্যায়ন এবং সম্মানের আশা করে। তাকে সম্মান দেখানোতে আপনার সম্মান তো

কমবেই না বরং এটা তার প্রতি আপনার ভালোবাসা এবং আকর্ষণেরই প্রমাণ বহন করবে। তাই তাকে অন্যের চেয়ে বেশি সম্মান করুন এবং তার সাথে নম্রভাবে কথা বলুন। তার ওপর অযথা চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না। তাকে সম্মানজনক এবং গুণবাচক শব্দগুলো দ্বারা সম্বোধন করুন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাকে সালাম দিয়ে আল্লাহ হাফেজ বলুন। কপালে চুমু দিয়ে বের হবেন। যদি মসজিদে নামাজে যান তখনো দিয়ে বের হবেন। রাসুল (সা.) এমনটি করতেন। এটি রাসুল (সা.) এর সুন্নাহ। বাহিরে যতক্ষণ কাজে থাকেন ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তাঁর খোজ নিন। কল করতে না পারলে একটি মেসেজ করে তাঁর খোঁজ নিন। ঘরে ফিরে তাকে আগে সালাম দিন। এটা রাসুল (সা.) এর সুন্নাহ। তাঁর সাথে উত্তম সম্ভাষোণ করুন। তাঁকে সুন্দর নামে ডাকুন। রাসূল (সা.) আয়িশা (রা.) কে হুমায়রা নামে ডাকতেন মাঝে মাঝে। অনেক মানুষের মাঝে তাকে অসম্মন করবেননা এমনকি একাকি থাকলেও না। আপনাকে মনে রাখতে হবে তিনি আপনার পরম বন্ধু,আপনার সুখ-দুঃখের সাথী,আপনার সন্তানের মা। যার সন্তুষ্টি ছাড়া আপনি সহজে জান্নাতে যেতে পারবেননা। মজা করেও তাই তাকে অম্মান করবেননা। মেয়েরা আর যাইহোক কখনো স্বামীর থেকে অসম্মান নিতে পারেনা। তাঁরা সবসময় সম্মান আশা করে। এমনটি কাম্য প্রত্যেক স্ত্রীর। স্বামীর অপমানের সামনে মাথা নত করে থাকা মানে এই নাযে তিনি আপনার থেকে কষ্ট পাচ্ছেননা বরং তিনি সবর করে আছেন। তার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা তাকে ঠিকই দিবেন। কিন্তু আপনাকে ঠিকই পাকড়াও করবেন। আমাদের সমাজ থেকে দিন দিন সম্মান জিনিসটা উঠে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী যে যেভাবে পারে একে অপরকে অপমান করে সামান্য বিষয় নিয়েই। স্ত্রীকেও স্বামীকে সম্মান জানাতে হবে। তাঁকেও মনে রাখতে হবে স্বামীর অসন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবেনা। পরিবারের সকল সিদ্ধান্তে তাকে মতামত গ্রহণের সুযোগ দিন। এটিও রাসুল (সা.) এর সুন্নাহ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নানা সমস্যা তাঁর স্ত্রীদের কাছে জানাতেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিতেন। যেমন: হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সাথে চুক্তি শেষ করে সাহাবাদেরকে হাদির পশু যবাই করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা রাসূলের হিকমত বুঝতে না পেরে যবাই করতে বিলম্ব করেন, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ ঘটনা জানান। তিনি এ সমস্যা সমাধানে সুন্দর মতামত দেন।

قَالَ عُمَرُ -: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا

এ ঘটনাটি উল্লেখ করে) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা উঠ এবং যবাই কর ও মাথা কামিয়ে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তিনবার বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে লোকদের এ আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি নাহর (যবেহ) করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু যবাই করলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। তা দেকে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে লাগলেন"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সাথে সুন্দর আচরণকারী ছিলেন, তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলতেন, মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করতেন, তাদের সাথে ভালোবাসা ও বদান্যতার সাথে আচরণ করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে পূর্ণাংগ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে উত্তম চরিত্রের ও তার পরিবারের সাথে সদব্যবহার করে"। (তিরমিযী)

ইবনে সা'দ রহ. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে একান্তে অবস্থানকালীন সময়ের স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বলেনঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে কোমল

ব্যক্তি, সদা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, তিনি কখনও তার সঙ্গীদের সামনে (তার শিষ্টাচারিতা ও পরিপূর্ণ সম্মানবোধের কারনে) পা প্রসারিত করে বসতেন না"।

৫) হাসিমুখে থাকা ও উত্তম কথা বলা : স্ত্রীর সাথে হাসিমুখে থাকা একটি সুখী ও শান্তিময় দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি। এটি কেবল সম্পর্কের মধুরতাই বাড়ায় না, বরং আপনার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। হাদীসে এসেছে হাসিমুখে থাকা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। তাই গোমরা মুখে থাকার সমীচীন নয়। আর উত্তম কথা বলাও সাদাকা। তাই স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম কথা বলা উচিত। এতে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কল্যাণমূলক কোন কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয়। (মুসলিম হা/২৬২৬)।

তিনি আরো বলেন, ভালো কাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। (আবুদাউদ হা/৪০৮৪)
অন্যত্র তিনি বলেন, উত্তম কথা সাদাকা। (বুখারী হা/২৯৮৯)।

৬) উত্তম ব্যবহার করা : আমি শুরুতেই আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি বলুনতো কেনো আপনার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে? অবশ্যই একটি সুখী দাম্পত্যজীবনের জন্য এটি আবশ্যক। এছাড়া তিনি আপনার সন্তানের মা, আপনার পরম বন্ধ, তার সন্তুষ্টি আপনার জান্নাত। তাহলে উত্তম ব্যবহার কেনো নয়? উত্তম ব্যবহার দিয়ে শত্রুকেও বন্ধু বানানো যায়। তাহলে একজন স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করাটা কতটা আবশ্যক। প্রত্যেক স্ত্রী চায় যে তাঁর স্বামী তার সাথে উত্তম ব্যবহার করুক। কিন্তু অনেক স্বামীরা বাহিরে সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর যখন ঘরে ফিরে তাদের মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে। সব রাগ যেনো স্ত্রী-সন্তানদের উপরে গিয়ে পরে। স্ত্রী কিছু বলতেই রেগে যায়, গালাগালি করে, সন্তানদের উপর রেগে যায়, তাদের মারধর করে। উত্তম ব্যবহারের পরিবর্তে আপনি যখন তাদের অনুত্তম ব্যবহার দিবেন তখন একটি পরিবারে আর কখনো শান্তি বিরাজ করেনা। অশান্তির দাবানলে পরিবার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আপনার সন্তান আপনার থেকে পালিয়ে থাকবে,সে আপনাকে ভালোবাসবেনা,সম্মান করবেনা,আপনার স্ত্রী আপনার সান্নিধ্য পেতেও অস্বস্তিবোধ করবে,সেও আপনাকে

আগের মতো আর ভালোবাসতে পারবেনা। পরিশেষে একটি পরিবার দুনিয়াতেই জাহান্নাম হয়ে যাবে। তাই স্বামীদের কখনোই উচিত নয় বাড়িতে এসে এমন ব্যবহার করা। নিজের রাগকে কন্ট্রোল করা। বাহিরে গেলে আপনাদের সাথে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। অফিসে বসের বকা খেতে পারেন, রাস্তায় জ্যামে পরতে পারেন, ব্যবসায় লস করতে পারেন ইত্যাদি। তাই বলে সেই রাগ আপনি বাড়িতে দেখাবেন এটি মোটেও কাম্য নয়। তাই নিজের রাগকে কন্ট্রোল করা শিখতে হবে। মানুষের সুখের অন্যতম হাতিয়ার উত্তম ব্যবহার। উত্তম ব্যবহার দিয়েই অন্যকে জয় করা যায়, তার হৃদয়ে আসন করে নেওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۝

আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।"(সুরা হা-মীম-সাজদাহ :আয়াত ৩৪)

তাই স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার ও আন্তরিক আচার-আচরণ করতে হবে। কেননা সে তার সকল আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে কেবল স্বামীর কাছে আসে। আল্লাহ বলেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"হে মুমিনগণ! নারীদেরকে জোরপূর্বক উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছ তা থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না—যদি না তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। অতঃপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন কোনো জিনিস অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন।" (সুরা নিসা :আয়াত ১৯)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসির (রহ.) বলেন, তোমরা তাদের সাথে সুন্দর কথা বল। তাদের জন্য সাধ্যমত তোমাদের আচার ও আকৃতিকে সুন্দর কর, যেমন তোমরা তাদের থেকে পছন্দ কর।(তাফসীর ইবনে কাসীর, ২/২৪২ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও ভালো ধারণা পোষণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, কোন মুমিন পুরুষ যেনো কোন মুমিন নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোনো আচরণ অপছন্দ হলে কোন আচরণ পছন্দ হবেই। (মুসলিম হা/১৪৬৯)

তিনি আরো বলেন,সে তোমার নিকটে তোমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার অধিকারী।(তাবরানী, ছহীহাহ হা/১৬৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যার আচরণ যত ভালো তার ঈমান তত বেশি পূর্ণ। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কল্যাণ করে। (বায়হাকি, হা/৬৬৫৩)

লোকমান হাকিম বলেন, একজন জ্ঞানী লোকের অবশ্যই পরিবারের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করতে হবে এবং পুরুষোচিত আচরণ ঘরের বাইরের জন্য রাখতে হবে।

৭) স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা : অবসর সময়ে স্ত্রীর সাথে একান্তে বসে কিছু গল্প-গুজব করা। তাঁকে সময় দেয়া,তার মনের কথা শুনা,তাকে বুঝার চেষ্টা করা, তার কোনো চাহিদা থাকলে তা জেনে নেয়া। প্রত্যেক স্ত্রী চায় স্বামীর সাথে একটু আলাদাভাবে বসতে,সময় কাটাতে। দু কাপ চা বা কফি হাতে নিয়ে খেতে খেতেও গল্প করা যায়। স্ত্রীর সাথে একান্তে সময় কাটানো ও খোশগল্প করা দাম্পত্য সম্পর্ককে মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী করার চাবিকাঠি। এটি মানসিক চাপ কমায়, পারস্পরিক বোঝাপড়া গভীর করে এবং দাম্পত্য জীবনকে একঘেয়েমি থেকে মুক্ত রাখে। রাসুল (সা.) ও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন। হাদিসে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ.

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (সুন্নত) সালাত আদায় করে, আমি যদি জেগে থাকতাম তবে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন, আর যদি (আমি) ঘুমিয়ে থাকতাম, তবে তিনি (সালাতের ইকামত) দেওয়া পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম নিতে।

(বুখারী হা/১১৬১)

অন্যত্র হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাতে সালাত শেষ করতেন, তখন লক্ষ্য করতেন। আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। আর ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে জাগাতেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়তেন। অবশেষে মুয়াযযীন এসে যখন ফজরের সালাতের জন্য তাঁকে ডাকতেন,তখন তিনি উঠে হালকা করে দু'রাকাত সালাত পড়ে ফরজ সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন

৮) স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হওয়া : স্বামীদের অন্যতম করণীয় নিজেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা। কেননা অপরিচ্ছন্না কেউ পছন্দ করেনা। নিজের স্ত্রীও না। নিয়মিত মেসওয়াক করা, শরীরে সুগন্ধী লাগানো। রাসুল (সা.) ঘরে প্রবেশ করে আগে মেসওয়াক করতেন। কেনোনা মুখের দূর্গন্ধ অন্যের জন্য অস্বস্তিকর। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হতে ওই রূপ পছন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পছন্দ করি। (তাফসীর কুরতবী, ৫/৯৭)

৯) বাড়িতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেওয়া: সালাম অর্থ শান্তি,নিরাপত্তা ও কল্যান। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা হয়। এটি মূলত একটি দোয়া বা প্রার্থনা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমত কামনা করা এবং মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও বিনয় বৃদ্ধি করা। শান্তি ও নিরাপত্তা কামনার ক্ষেত্রে প্রথম হকদার নিজের পরিবার। কেননা সালাম বিনিমায়ের মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায় সেজন্য বাড়ি থেকে বের হতে ও বাড়িতে প্রবেশ কালে বাড়ির অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রা.) বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন , হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার পরিজনের নিকটে যাও তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে। (তিরমিযী হা/২৬৯৮)

তিনি আরো বলেন, 'তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে রিজিক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে জান্নাতের প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির লোকদেরকে সালাম দেয়, সে

আল্লাহর জিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ জিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয় সে আল্লাহর জিম্মায়। (সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৯)

১০) স্ত্রীকে কাজে সাহায্য করা : স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী। তারা একে অপরকে যেমন সম্মান করবে তেমনি একে অন্যের কাজে সাধ্যমতো সহায়তা করবে। এটি রাসুল(সা.) এর সুন্নাহ। আপনি বাইরের কাজ করে এসে দেখলেন আপনার স্ত্রীর রান্না বা অন্যান্য কাজে বিলম্ব হচ্ছে, এতে আপনি ভ্রূকুটি না করে তার কাজে সহযোগিতা করুন, দেখবেন আপনাকে সে কত ভালোবাসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন।

عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ»

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তার স্ত্রীদের সাথে কী কী করতেন তা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, “তিনি স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি নামাযে যেতেন”। (বুখারী)

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতাপ দেখানোর মত লোক ছিলেন না। বরং নিজের কাজ নিজেই করতেন। এ হাদীস দ্বারা তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, তাদের সাথে ঔদ্ধত্য আচরণ করা যাবে না।

আপনার স্ত্রী বাড়িতে সন্তান সন্ততি লালন পালন, সাংসারিক কাজ ইত্যাদি ঝামেলায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন। ফলে অনেক সময় আপনাকে সময় দিতে পারেন না। তাতে আপনি তার উপর রাগ না করে আপনার ছোট খাট কাজ আপনি নিজেই সেরে ফেলতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই করতেন।

سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ»

এক লোক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? উত্তরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন,

“হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং পুরুষরা ঘরে যা করে তিনি তা করতেন”।(মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৪৭৪৯, সহীহ ইবন হিব্বান: হাদীস নং ৫৬৭৬-৫৬৭৭)

তিনি পৃথিবী শুরু শেষ পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে এবং আসবে সকল মানুষের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি যদি স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতে পারেন তাহলে আপনি তার উম্মত হয়ে কেনো পারবেননা?

১১) স্ত্রীর প্রতি সুধারনা রাখা : স্ত্রীর প্রতি সুধারণা রাখা দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি। বিনা কারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রতিটি কাজে তার ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করা উচিত। এতে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং পারিবারিক শান্তি বজায় থাকে। স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করলে দাম্পত্য জিবন হুমকির মুখে পরে যাবে। সংসারে অশান্তি দানা বাধবে। কেননা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়ের বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, সততা, সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা, অনাবিল প্রেম, অকৃত্রিম ভালোবাসা, নম্রতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ,একে অপরের উপকার স্বীকার করা ইত্যাদি গুণ একে অপরের থাকা প্রয়োজন। আর সন্দেহ এসব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেলে যতক্ষণ না তাকে উপড়ে ফেলা হয়, ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে। এই সন্দেহ-সংশয়ের ফলে সংসার পরিণত হয় এক প্রকার জাহান্নামে। এরুপ সংসার স্থায়ী হয়না। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আর যদি তোমরা মার্জনা করো, এড়িয়ে চলো এবং ক্ষমা করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।" (সুরা তাগাবুন: আয়াত ১৪)।

স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা ঠিক নয়।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু (সুরা হুজুরাত : আয়াত ১২)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মন্দ ধারণা পোষন করা হতে বেঁচে থাকো, কারণ মন্দ ধারণা পোষণ সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথা। (বুখারী হা/৫১৪৩)

স্ত্রীদের প্রতি সুধারনা পোষন করা মুমিনদের জন্য অবশ্য করণীয়। যেমন আল্লাহ বলেন,
لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ۝
তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?" (সুরা নুর :আয়াত ১২)

১২) স্ত্রীর হক আদায় করা: একজন স্ত্রী নিজের পরিবার, পরিবেশ ও স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে স্বামীর সংসারে আসেন। স্বামীর উপর আস্থা রেখেই তিনি জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন। এই বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়া স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব। বিবাহের পরে স্বামীর উপর অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সকল হালাল চাহিদা পূরণ করা।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর ও হক আছে। (বুখারী হা/১৯৭৫)

১৩) স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ও তাকে গুরুত্ব দেওয়া : একটি পরিবার গড়ে ওঠে স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে। একে অপরের সহযোগিতায় একটি সুখী পরিবার গড়ে ওঠে। এখানে কারো অবদান কম করে দেখার সুযোগ নেই। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক দুজনেই দুজনের জায়গা থেকে অবদান রাখার চেষ্টা করে। স্বামী পরিবারের ভরণপোষণের জন্য

বাহিরে কাজ করে অপরদিকে স্ত্রী তার পরিবারের দেখা শুনা করে। তাই পরিবারের বা যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা। যদি উত্তম পরামর্শ হয় গ্রহণ করা নাহলে তাকে বুঝিয়ে বলা এটা এমন করা যাবেনা। কুপরামর্শ শোনা যাবেনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন সাহাবিরা কুরবানি করতে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, তখন রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শে নিজে মাথা মুণ্ডন করেন এবং কুরবানি করেন। তাঁর এই দৃশ্য দেখে সাহাবিরাও অনুসরণ করেন। (বুখারী হা/২৭৩২)

১৪) স্ত্রীকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া : প্রত্যেক স্বামীর অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে নিজের স্ত্রীকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া। কেননা পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি। আর মা হলেন সন্তানের প্রথম পাঠশালা। স্ত্রী শিক্ষিত ও জ্ঞানী হলে তিনি নিজ সন্তানকে আদর্শ চরিত্র ও ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে পারেন, যা একটি সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে। স্ত্রীর দ্বীনি ইলম থাকলে সে বুঝতে পারবে সংসারো একটা ইবাদাত। আর এই ইবাদাতটা তাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। স্ত্রীর ইলম থাকলে সংসার সুখের হয়। একটি পরিবার জান্নাতি পরিবার হয়ে যায়। রাসুল (সা.) মালেক বিন হুওয়াইরিছ ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদের মাঝে অবস্থান কর, তাদের দ্বীন শিক্ষা দাও এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর তোমরা সেভাবেই সালাত (নামাজ) আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে সবচেয়ে বড়, সে তোমাদের ইমামতি করবে।"(বুখারী হা/৬৩১)

হাদিসেও পরিবারে দ্বীনি ইলম শিক্ষাদানের বিষয়ে জোড় দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর যদি তেমন কোনো ইলম না থাকে তাহলে তাকে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো,ইবাদাতের পদ্ধতি এসব শিক্ষা দেওয়া। বাসায় তা'লিমের ব্যবস্থা করা। যদি নিজ বাড়িতে সম্ভব না হয় তাহলে নিজ এলাকার তালিমের মজলিসে যেতে দেওয়া। এছাড়া অনলাইনে এখন ঘরে বসেই ইলম অর্জন করা যায়। কুরআন সহিহ করণ,ফরজে আইন কোর্স সহ অনেক কোর্স এখন পাওয়া যায় সেগুলো করতে দেওয়া।

১৫) স্ত্রীকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া : পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে এবং ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করতে স্বামীকে পরিবারের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল হিসেবে স্ত্রীর দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা ও নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরিম, আয়াত ৬)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিষ্ক চাই না। আমিই তোমাকে রিষ্ক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (সুরা ত্ব-হা :আয়াত ১৩২)

নবী-পত্নী উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) ভীত ও চমকে গিয়ে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন:

"সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা এই রাতে কতই না ভান্ডার (রহমত ও সম্পদ) অবতীর্ণ করেছেন এবং কতই না ফিতনা (বিপদ ও বিপর্যয়) নাজিল করেছেন! হুজরাবাসিনীদেরকে (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীগণকে) কে জাগিয়ে দেবে, যেন তারা সালাত (নামাজ) আদায় করে?"

এরপর রাসুল (সা.) আরও বললেন: "দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা (নারী) পরকালে (আখিরাতে) উলঙ্গ বা বিবস্ত্রা হবে।(বুখারী হা/৭০৬৯)

১৬) স্ত্রী অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রুষা করা: স্ত্রী আপনার পরম বন্ধু। হাদিসে যাকে আপনার পোশাক হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে। সেই পরম বন্ধু যখন অসুস্থ হয় তখন আপনার সান্নিধ্যই সে বেশি চাইবে। সে চাইবে আপনি তার একটু সেবা-যত্ন করুন। একটু দেখভাল করুন,তার ওষুধ ও খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখুন। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী যদি একটু স্ত্রীর সেবা-যত্ন করে,কাজে সহায়তা করে তাকে যে কত প্রকার কথা শুনতে হয়। কিন্তু হাদিসে দেখতে পাই রাসুল (সা.) সাহাবীদেরকে স্ত্রীর অসুস্থায় পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তার বিবিদের জন্য অসুস্থতায় দুয়া করেছেন। নবী কারীম (সা.) তাঁর কোনো বিবি বা পরিবারের সদস্য অসুস্থ হলে তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির দোয়া করতেন।

হাদিসে এসেছে,হজরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী এবং মহানবী (সা.)-এর কন্যা হজরত রুকাইয়া (রা.) বদর যুদ্ধের আগে কঠিনভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাই মহানবী (সা.) তাকে বদর যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন এবং মদিনায় থেকে স্ত্রীর সেবা করার নির্দেশ দেন। তবে রাসুল (সা.) তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব ও গনিমতের অংশ লাভ করবেন।(বুখারী হা/৩১৩০,৩৬৯৮)

অপর হাদিসে আছে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন এক স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান এবং বলেন,
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
হে আল্লাহ! মানবজাতির প্রতিপালক, আপনি কষ্ট ও রোগ দূর করে দিন এবং আরোগ্য দান করুন। আপনিই প্রকৃত আরোগ্যকারী, আপনার আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোনো আরোগ্য নেই; এমনভাবে আরোগ্য দান করুন, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না। (বুখারী হা/৫৭৫০)।

১৭) স্ত্রীর সুস্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা : স্ত্রীর সুস্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা প্রত্যেক স্বামীর একান্ত কর্তব্য। কেনোনা স্ত্রী হলো পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। তিনি সুস্থ থাকলে পুরো পরিবারের যত্ন নেওয়া সহজ হয়। সংসার ও কর্মক্ষেত্রের দ্বৈত চাপে নারীরা অনেক সময় মানসিক অবসাদে ভোগেন। স্বামীর ভালোবাসা ও যত্ন মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া সুস্থ মা একটি সুস্থ ও মেধাবী সন্তানের জন্ম দিতে পারে। গর্ভাবস্থা এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে বিশেষ যত্ন না নিলে মা ও শিশুর বড় ধরনের শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। নারীদের দেহে আয়রনের ঘাটতি (রক্তশূন্যতা), অস্টিওপরোসিস, থাইরয়েড ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি থাকে। নিয়মিত সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে এ রোগগুলো থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

১৮) স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা : কারো একাধিক স্ত্রীর থাকলে তাদের সাথে ইনসাফ করা জরুরি। ইসলামে একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে ভরণ-পোষণ,

রাত্রিযাপন ও সামগ্রিক আচরণে সমতা বা ন্যায়বিচার করা ফরজ। বৈষম্য বা অবিচার করা কবিরা গুনাহ এবং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বিষয়ে হাদিসে কঠোর হুশিয়ারি আছে। কাল কেয়ামতের ময়দানে প্রত্যেককে তাদের জিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদিসে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকবে এবং একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়বে, সে কিয়ামত দিবসে এই অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের একাংশ একদিকে ঝুঁকে থাকবে।(তিরমিযী হা/১১৪১)

১৯)স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া : বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। দাম্পত্য সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে, পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে, সঙ্গীকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করতে এবং সুন্দর জীবনের জন্য তাকে দিকনির্দেশনা দেওয়া প্রত্যেক দায়িত্বশীল স্বামীর কর্তব্য। তবে সদুপদেশ দিতে হবে নম্রতার সাথে। এমনভাবে বকাঝকা করবেননা যেনো সে কষ্ট পায়। বিদায় হজের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন,

তোমরা স্ত্রীদেরকে উত্তম নসিহত প্রদান কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তাহলে ভিন্ন কথা) (তিরমিযী হা/১১৬৩)

২০)স্ত্রীর পরিবারকে সম্মান করা : স্বামী যেমন আশা করে তার স্ত্রী তার মা-বাবাকে ও তার পরিবারের মানুষকে সম্মান করুক তেমনি স্ত্রীও আশা করে তার স্বামীও তার পরিবারকে সম্মান করুক। কারণ সবাই আমরা সম্মানের প্রত্যাশা করি। এটা মানবীয় একটি চাওয়া। স্ত্রীর যেমন স্বামীর পরিবারকে সম্মান করা জরুরি তেমনি স্বামীর জন্যও জরুরী তিনি তার শশুর বাড়ির আত্নীয়স্বজনকে সম্মান দেখাবেন। এতে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। একে অপরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা,সম্মান,ভালোবাসা বেড়ে যাবে। যা তাদের সাংসারিক জিবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ইনশাআল্লাহ। এতে স্ত্রীর মন প্রফুল্ল থাকবে ফলে সে সংসারের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে আনন্দচিত্তে সম্পাদন করবে।

২১) স্ত্রীর পরিবারের মানুষের বিপদে সহায়তা করা : পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এটি আপনাদের নিজেদের দাম্পত্য জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আপনি স্ত্রীর পরিবারকে নিজের পরিবার মনে করলে তারাও আপনাকে সম্মান করবে এবং আপনার পরিবারের যেকোনো প্রয়োজনে তারাও এগিয়ে আসবে। আমরা দৈনন্দিন জিবনে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক ঘটনার সম্মুখীন হই। এই বিপদের সময়ে সবচেয়ে আপনজনরাই কাজে লাগে। কথায় বলে,বিপদে বন্ধু চেনা যায়। বিপদের সময় পাশে দাঁড়ালে স্ত্রী বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বামী কেবল তাঁর জীবনের সঙ্গীই নন, বরং তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। এতে সম্পর্কের প্রতি গভীর আস্থা ও নিরাপত্তা জন্মায়। একজন দায়িত্বশীল জীবনসঙ্গী হিসেবে স্ত্রীর বাবা-মা বা ভাই-বোনের বিপদে সাহায্য করা নৈতিক দায়িত্ব। এটি আপনাদের মানসিক পরিপক্কতাও প্রমাণ করে।

২২) স্ত্রীকে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া : ইসলামসহ প্রায় সব সমাজ ও ধর্মে স্ত্রীর আত্মীস্বজন ও বাবা-মায়ের সাথে সুসম্পর্ক (রেহেম) বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীকে তার মা-বাবার সাথে দেখা করার সুযোগ দেওয়া তার অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। দীর্ঘ সময় নিজের পরিবার ও বাবা-মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকলে যেকোনো মানুষের মধ্যে একাকীত্ব ও বিষণ্ণতা কাজ করতে পারে। নিয়মিত যোগাযোগ ও সাক্ষাতের সুযোগ তাকে মানসিকভাবে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখে। এছাড়া মায়ের মানসিক অবস্থা তার সন্তানদের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। মা মানসিকভাবে শান্ত ও সুখী থাকলে তা পুরো পরিবারের পরিবেশকে সুন্দর রাখে এবং সন্তানের বেড়ে ওঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এসব দিক বিবেচনা করে স্ত্রীকে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে। তিনি যদি অসুস্থতায় একটু বাবার বাড়ি যেতে চান পারিবারিক কোনো সমস্যা না থাকলে তাকে সম্ভব হলে কিছুসময় বা কিছুদিনের জন্য রেখে আসবেন। হাদিসে এসেছে,

ইফকের ঘটনা কালে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে তিনি পিতার বাড়িতে গমনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অনুমতি চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। (বুখারী হা/২৬৬১, ৪১৪১)

২৩) স্ত্রীর ত্রুটি- বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা : মানুষ মাত্রই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই মানুষ হিসেবে আপনার স্ত্রীর কোনো ভুল-ত্রুটি হতে পারে। একই রকম ভুল আপনার ক্ষেত্রেও হতে পারে। আপনি যেমন চাইবেন আপনার ভুল ত্রুটি স্ত্রী ক্ষমা করে দিক তেমনি স্ত্রীও চাইবে তার ভুল -ত্রুটি আপনি ক্ষমা করে দিন। একে অপরের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করলে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা এবং বিশ্বাস বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও স্ত্রীদের সাথে কোমল আচরণ ও ক্ষমার আদর্শ স্থাপন করেছেন। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে ধৈর্যের বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে কোন আচরণ পছন্দ হবেই। (মুসলিম হা/১৪৬৯)

তিনি আরো বলেন, নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে বাম পাজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে তাকে ভেঙে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর। (আহমাদ হা/২০১০৫)

অন্যত্র তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। আর নারীদের সদুপদেশ প্রদান কর। কেননা পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাঁজরের সর্বাধিক বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে স্বীয় অবস্থায় রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি সদুপদেশ দান কর। (মুসলিম হা/১৪৬৮)

২৪) প্রহার না করা : স্ত্রীদের বিনা কারণে বা তুচ্ছ কোনো ঘটনায় প্রহার করা উচিত নয়। বড় তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। আর প্রহার করা রাসুলের আদর্শ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাঁর স্ত্রীগণকে প্রহার করেননি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কোন কিছুকে প্রহার করেননি। না তাঁর কোন স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে। (মুসলিম হা/২৩২৮)

তিনি স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে অস্বাভাবিক প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে। অতঃপর সম্ভবত ঐ দিনের শেষাংশে সে আবার তার শয্যাসঙ্গী হয়। (বুখারী হা/৪৯৪২)।

অন্যত্র তিনি বলেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা দিনের শেষে তার সঙ্গে মিলিতো হবে। (বুখারী হা/৫২০৪)

তিনি আরো বলেন, যারা এভাবে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়। (আবুদাউদ হা/২১৪৬)।

২৫) অযথা দোষ না খোঁজা : অনেক পুরুষ আছে যারা সবসময় দোষ খুজে বেড়ায়। তারা সবসময় তাদের মনমতো সব কিছু চায়। এটা বুঝতে চেষ্টা করেনা অপর মানুষটিরো সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে। তারা অল্পতেই চিৎকার চেচামেচি শুরু করে। এই জিনিস এখানে কেনো,এখনো চা-কফি রেডি হয়নি কেনো, এখনো রান্না রেডি হয়নি ইত্যাদি। তারা সবসময় যখন অল্পতে চিল্লাচিল্লি করবে স্বাভাবিক ভাবেই একজন স্ত্রীর মন খারাপ হবে,সে কষ্ট পাবে। হতে পারে সে অসুস্থ, বা বাচ্চার টেককেয়ার করতে সময় পায়নি ইত্যাদি। তাই এরকম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২৬) মাঝেমাঝে স্ত্রীকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া : সংসারের একঘেয়েমি দূর করতে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক আরও মধুর ও সতেজ করতে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে মানসিক প্রশান্তি আসে এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বহুগুণ বেড়ে যায়।

২৭) সাধ্যমতো হাদিয়া দেওয়া : পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করার জন্য উপহার আদান-প্রদান খুবই উত্তম কার্যকর পন্থা। একে অপরকে হাদিয়া বা উপঢৌকন বিনিময় করলে মহব্বত সৃষ্টি হয়। মনের কলুষতা দূরীভূত করে। বিশেষত নারীরা সামান্য উপহার পেলেও অতি আনন্দিত হয়। পরিবারে সুখ-শান্তি অটুট রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে হাদিয়া বা উপহার দেওয়া স্বামীর উচিত। পুরুষরা প্রায় দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে।

এ সময় স্ত্রীর পছন্দনীয় কোন বস্তু স্বল্প মূল্য হলেও যদি স্ত্রীর জন্য কিনে আনে তাতে স্ত্রীর খুশীর সীমা থাকে না। এর দ্বারা স্ত্রী থেকে কোন বাড়তি কাজ আদায় করতে চাইলে স্ত্রীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তা করতে প্রস্তুত থাকে। কারণ এর মাধ্যমে স্ত্রী বুঝতে পারে যে, স্বামী তাকে খুবই পছন্দ করে। সফরে গিয়েও আমার কথা ভুলেনি। নারীরা এটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করে। আর স্ত্রীরও উচিত স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ফলে আরেক সময় স্ত্রীর জন্য হাদিয়া নিতে উৎসাহী হবেন।

স্বামীর নিকটে স্ত্রীর অধিকার

১)আশ্রয় দান : স্ত্রীকে আশ্রয় দান করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। যেখানে আপনার স্ত্রী থাকতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে ও নিরাপদ ভাবে।

আল্লাহ বলেন, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস করো সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দিও। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না। (সুরা ত্বলাক:আয়াত ৬)

২)ভরণ-পোষণ : স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব।আল্লাহ বলেন,
ْأَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم
পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।(সূরা নিসা-৩৪)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে।(সূরা তালাক-৭)

হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত।

وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْت (ِ

তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমন্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে।(আবু দাউদ-২১৪২,ইবনে মা'জা-১৮৫০)

কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে তাহলে সে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ পাপী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিজিক নষ্ট করে। (আবুদাউদ হা/১৬৯২)

সামর্থ্য থাকার পরেও ভরণপোষণ না দেয়ার জন্য গুনাহগার হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সেটা সংরক্ষণ করেছে না তাতে অবহেলা করেছে। এমনকি পুরুষকে তার স্ত্রী (পরিবার-পরিজন)সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন। (নাসাঈ, আস- সুনানুল কুবরা হা/৯১৭৪)

পক্ষান্তরে পরিবারের জন্য খরচকৃত অর্থের ফজিলত অনেক বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উত্তম হলো ওই দীনার যা কোন ব্যক্তি পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে। (মুসলিম হা/৯৯৪)।

অন্যত্র তিনি বলেন, এক দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে খরচ করো। এক দীনার দরিদ্রদের জন্য, এক দীনার দাসমুক্তির জন্য এবং এক দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব লাভ হয় ওই দীনারে, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর। (মুসনাদ হা/১০১৩২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার -পরিজনের জন্য পূণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার জন্য সাদাকা হয়ে যায়।(বুখারী হা/৫৫)

এমনকি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পানি পান করায় তার জন্যও তার নেকী রয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে পানি পান করায় তখন সে তার বিনিময়ে সওয়াব পায়।(মুসনাদ হা/১০১৩২)

স্বামী সাধ্যমতো স্ত্রীকে পোষাক-পরিচ্ছদ দান করবে। রাসুল (সা.) বলেন, আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে তোমরা যথাসম্ভব তাদের পোশাক - পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে। (তিরমিযী হা/১১৬৩)।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এমন অনেক দায়িত্বহীন মানুষ আছে, যারা নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে ভালো ও মানসম্মত পোষাক কিনে দেয়না। অথচ নিজে ভালো পোষাক পরে।

৩) স্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা এবং পর্দার পরিবেশ রাখা : স্বামীর উপরে স্ত্রীর অন্যতম অধিকার হলো তার নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা, যাতে তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, মান -সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং সে ঐ পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। সেই সাথে দ্বীনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। এবং সকল ফেতনা থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারে।

বিবাহপূর্ব স্ত্রীর করণীয়

১)মানসিক প্রস্তুতি ও নিয়ত যাচাই: বিবাহের পূর্বে একজন নারীকে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। একজন নারী বাবার বাড়িতে যেমন থাকে চাইলে সে শশুর বাড়িতে গিয়ে সেভাবে থাকতে পারবেনা। নতুন পরিবেশে চলতে অনেক সমস্যা হতে পারে। তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে সে একটি বিশাল দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। তাকে সংসার পরিচালনা করতে হবে, স্বামীর হক আদায় করা লাগবে, সন্তান প্রতিপালন করতে হবে, অনেক সময় অন্যদের কটু কথাও শুনতে হতে পারে ইত্যাদি। তাই সবদিক থেকে তাকে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাহলে পরবর্তীতে বিষয়গুলো তার কাছে সহজ

মনে হতে পারে। একই সাথে নিয়তো যাচাই করতে হবে। হাদিসে এসেছে, সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সে আসলে কেনো বিয়ে করছে,বিয়ের উদ্দেশ্য আসলে কি এসব জানতে হবে ভাবতে হবে,নিয়ত যাচাই করতে হবে। সংসার ও একটি ইবাদাত হতে পারে যদি নিয়ত শুদ্ধ হয়।

২) পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দেওয়া : একজন স্বামী যেমন স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিবে তেমনি একজন স্ত্রীও স্বামীর দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিবে। স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে সে তার অনাগত সন্তানের বাবাকে নির্বাচন করতে যাচ্ছে। তাই দ্বীনদারিতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে। অন্যান্য দিকেও খেয়াল করতে হবে তবে দ্বীনদারিতাই প্রধান বিষয় যেনো হয়।

৩)ইস্তিখারা করা : ইস্তিখারা বলতে বুঝায় কোনো বৈধ কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আল্লাহর কাছে কল্যাণ বা মঙ্গল কামনা করা এবং সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য সাহায্য চাওয়া। বৈবাহিক জিবনের সাথে যেহুতু আমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যানের বিষয় জড়িত তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে ইস্তিখারা করে নেওয়া জরুরি।

৪) দুয়া করা : দুয়ার বিকল্প নেই। প্রত্যেক বিষয়েই আমাদের দুয়া করা উচিত। কাজটি যেনো কল্যানকর হয়। বৈবাহিক জিবন যেনো সুখের হয়,কল্যানময় হয়, স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সবাই যেনো কল্যানকর হয়,ভালো হয় এসব দুয়া অবশ্যই করা উচিত।

৫) ছেলের সাধ্যমতো মোহর চাওয়া : মোহর নির্ধারণের সময় কনের পরিবারের সমমর্যাদার নারীদের (যেমন: বোন বা ফুফু) কত মোহর হয়েছিল, সেটিও বিবেচনা করা হয়।

তবে কনের পরিবারের মর্যাদার পাশাপাশি স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যেনো মোহর পরিশোধ সহজ হয়। কিন্তু আজকের সমাজে উল্টো চিত্র দেখা যায়। মোহর অনেক বেশি ধার্য করে কারণ পরবর্তীতে সংসার না করলে মেয়েকে সব টাকা বুঝায় দিতে হবে অথবা ছেলে যেনো সহজে মেয়েকে ডিভোর্স দিতে না পারে। শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি চিন্তাও ঠিক না।

৬) বিবাহের পূর্বেই সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা : বিবাহের পূর্বে স্বামীর পাশাপাশি একজন স্ত্রীকেও সাংসারিক বিষয়ে, বৈবাহিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে।যেমন- স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার , দায়িত্ব ও ইসলামি দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে পড়াশোনা বা মুরব্বিদের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়া। এবং সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কেও অবশ্যই জ্ঞানার্জন জরুরি। এ বিষয়ে মুরুব্বিদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কিতাব পড়া এবং কোর্স করা জরুরি। কেনোনা মুরুব্বিদের মাঝেও অনেক কুসংস্কার আছে আবার আমাদের বাপ-দাদাদের সময়ের বাচ্চা প্রতিপালন আর এখনকার সময়ে বাচ্চা প্রতিপালন আসমান-জমিন তফাৎ।

৭) সাংসারিক কাজকর্মগুলো পৃত্রালয়েই শেখা : সংসার করা খুব সহজ বিষয় নয়। অনভিজ্ঞদের জন্য তা বেশ কঠিন। কারণ সংসার মানে শুধু এটা নয় যে, ঘরে যা কিছু আছে সেগুলো মাচায় উঠিয়ে রাখবে। সিন্দুক থেকে অর্থ বের করে বিভিন্ন জিনিস আনতে দিবে। নানা ধরনের খাবার রান্না করে একের পর এক খাওয়া দাওয়া করবে। এরপর বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়বে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে। সংসার তো এমন বিষয় যার জন্য অনেক আকল বুদ্ধি দরকার। হিম্মত ও সাহস দরকার। উন্নত আখলাক দরকার। যোগ্যতা, দক্ষতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ দরকার। এসব জিনিস না থাকলে সংসার করা কঠিন হয়ে যায়। সাধের জীবনটা মাটি হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকটি মেয়ের উচিত পৃত্রালয়েই থাকতে সাংসারিক কাজকর্মগুলো শিখে নেওয়া। সংসারের সকল বিষয় নিজ পরিবার থেকে শিখে নিলে শশুরালয়ে গেলে সকল কাজ করতে এবং মানিয়ে নিতে সুবিধা হয়। সাংসারিক বিষয়ে বিভিন্ন কাজ যেমন- রান্নাবান্না,ঘর গোছানো ইত্যাদি।

৮) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : আমাদের দৈনন্দিন জিবনে সকলকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় এবং থাকা উচিত। একজন মেয়েকে অবশ্যই এ বিষয়ে আরো জোর দিতে হবে। শুধু নিজেকেই পরিপাটি রাখলে হবেনা। পৃত্রালয়ে থাকতেই বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল করতে হবে। মায়ের সাথে সাথে সব কাজ করা শিখতে হবে বা অন্যান্য সদস্যদের সাথে। নাহলে দেখা যাবে বাবার বাড়িতে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে শশুর বাড়িতে গিয়েও একই কাজ করে। তখন শশুর বাড়িতে এই নিয়েও অনেক সমস্যা হতে পারে। কারণ অপরিচ্ছন্নতা কেউ পছন্দ করেনা। তাই

নিজের পোশাক-আশাক,বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সবকিছুই বাবার বাড়ি থেকে শিখতে হবে।

৯)মিতব্যয়ী হওয়া : পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে স্ত্রীকে মিতব্যয়ী হতে হয়। সংসার পরিচালনায় আয়ের সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য রাখা জরুরি। আর এই মিতব্যয়ী হটাৎ চাইলেই হওয়া যায়না। তাই বাবার বাড়ি থেকেই এই গুণ অর্জনের অভ্যাস করতে হবে। তবেই শশুর বাড়িতে গিয়ে মিতব্যয়ী হওয়া সম্ভব।

১০)ফরজ ও নফল ইবাদাতে মনোযোগী হওয়া : আমাদের দুনিয়াতে পাঠানোর প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর হক আদায় করা। তার ইবাদাত করা। তাই আমাদের ফরজ ইবাদাতের পাশপাশি যেসকল নফল ইবাদাত আছে সেগুলোর প্রতিও যত্নবান হতে হবে। একজন মেয়েকে অবশ্যই তার বাবার বাড়ি থেকে ইবাদাতের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাহলে শশুর বাড়িতে গিয়ে হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও আল্লাহর হক আদায় করতে ভুলবেনা সে।

১১) নৈতিক গুনাবলী অর্জন করা : একজন আদর্শ ও চরিত্রবান নারী অবশ্যই নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হবে। তাকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে, লজ্জাশীল হতে হবে, ধৈর্য ও ক্ষমা, বিনয় ও নম্রতার গুণ থাকতে হবে। এসব গুণাবলী না থাকলে সাংসারিক জিবন সুখের হবেনা। সে অল্পতেই অধৈর্য হয়ে যাবে। পরিশেষে সংসার টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যাবে। তাই বাবার বাড়ি থেকেই এসব গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে পরবর্তী জীবনে এসব গুণাবলীর প্রয়োগ ঘটিয়ে সংসার জিবনকে সুখময় করতে পারবে।

বিবাহ পরবর্তী স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১) ধৈর্যশীল হওয়া : একজন স্ত্রীকে অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হবে। নতুন সংসারে গিয়ে তাকে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। তাই সকল কিছুতে তাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। শশুরালয়ের অনেকে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে। তখনো ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। নিজের স্বামী প্রদত্ত কষ্ট ও তার দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করা এবং একে সওয়াবের কারণ মনে করা উচিত। তার পক্ষ থেকে খারাপ আচরণ পেলেও তা সহ্য করা এবং তার শয্যা পরিত্যাগ না করা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লানত করতে থাকে। বুখারী হা/৩২৩৭)

অন্যত্র তিনি বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তাহলে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে। (বুখারী হা/৫১৯৪)

২) অন্যের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা : একজন স্ত্রীর যাবতীয় সাজসজ্জা তার স্বামীর জন্য হবে। অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, যা সাধারণত প্রকাশমান। তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বা কাপড় বুকের ওপর ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজদের নারীসঙ্গী, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ বা এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে

সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সুরা নুর: আয়াত ৩১)

স্বামী স্ত্রীকে যেমন সাজসজ্জায় দেখতে পছন্দ করে তাকে তাঁর সামনে সেভাবেই থাকা উচিত। এতে স্বামীর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, মন প্রফুল্ল থাকে এবং সে আনন্দিত হয়। হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়।(নাসাঈ হা/৩২৩১)

সুতরাং স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাজসজ্জা করা বৈধ নয়। যদি কেউ অন্যকে দেখানোর জন্য সাজসজ্জা করে এবং সুঘ্রাণ ব্যবহার করে তাহলে সেটা তার জন্য অকল্যাণের কারণ হবে।
হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করল অতঃপর লোকদের পাশ দিয়ে এ উদ্দেশ্যে অতিক্রম করল যে তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায় তাহলে সে ব্যভিচারিণী। (নাসাঈ হা/৫১২৬
)
একজন উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য হল সে স্বামীকে মন প্রাণ উজার করে ভালবাসবে এবং তার জন্যই তার সকল সাজসজ্জা হবে। সে সদা সর্বদা স্বামীর মনোতুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। সে স্বামীর সুখেই সুখী হবে, স্বামীর দুঃখে দুঃখী হবে। স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি সদা সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।
সাধারণত স্ত্রী স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে ফুটন্ত গোলাপ সদৃশ হয়ে থাকবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, সাজসজ্জায় ও বেশভূষায় স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। সৌন্দর্য ও সৌরভে ভরা গোলাপের দিকে এক পলক তাকিয়ে যেমন মন প্রাণ আকৃষ্ট হয় স্বামীর মনো তার স্ত্রীর দিকে প্রফুল্ল হবে।

৩)নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করা : ইসলামে স্ত্রীসহ প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্যই নিজের লজ্জাস্থান বা সতীত্ব হেফাজত করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বলেন

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর তাদের সৌন্দর্য (প্রকাশযোগ্য অংশ ব্যতীত) যেন প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজ ধর্মের নারী, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে এমন অনুগত ব্যক্তি যাদের নারীদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই অথবা এমন শিশু যারা নারীদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ—ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"(সুরা নুর : আয়াত ৩১)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী (মুমিন) পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী—এদের সবার জন্যই আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও এক মহা পুরস্কার। (সুরা আহযাব : আয়াত ৩৫)

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَـحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْـجَنَّةَ«
“যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহ্বা এবং উভয় পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো”। (সহীহ বুখারী হা/ ৬৪৭৪)

উবাদাহ ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْـجَنَّةَ: اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا الْأَمَانَةَ إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُم«
“তোমরা নিজ থেকেই ছয়টি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। তোমরা কথা বললে সত্য বলবে। ওয়াদা করলে তা পুরা করবে। কেউ তোমাদের নিকট কোনো কিছু আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করবে। লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে। চোখকে নিম্নগামী করবে এবং হাতকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে”(সহীহুত তারগীবী ওয়াত তারহীবী, হাদীস নং ১৯০১)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»إِذَا صَلَّتِ الْـمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْـجَنَّةِ شَاءَت«
“কোন মহিলা যদি রীতি মতো পাঁচ বেলা সালাত পড়ে, রামাদানের সাওম পালন করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে; উপরন্তু তার স্বামীর আনুগত্য করে তা হলে সে জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে চায় ঢুকতে পারবে”। (সহীহুত তারগীবী ওয়াত তারহীবী, হাদীস নং ১৯৩১)।

৪) স্বামীকে মন উজার করে ভালোবাসা : প্রত্যেকেই এমন জীবন সঙ্গী আশা করে যে তাকে অনেক বেশি ভালবাসবে। একজন স্ত্রী যেমন চায় তার স্বামী তাকে মন উজার করে ভালোবাসা হোক তেমনি একজন স্বামী ও চায় তাকে তার স্ত্রী মন উজার করে ভালবাসুক। কেননা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা না থাকলে সেই পরিবারে কখনো সুখ থাকতে পারে না। একজন স্বামী একজন নেককার স্ত্রীর কাছে যে সুখ পায় তা আর কোথাও পাওয়া সম্ভব না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।” (সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১)
এই মহব্বত,ভালোবাসা হলো আল্লাহ প্রদত্ত।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, “তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭)
যে ভালোবাসা শুধু রূপের সৌন্দর্য দেখে হয় তা কখনো স্থায়ী হয় না। চিরস্থায়ী ভালোবাসা হলো খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। ভালোবাসা দিয়ে কোন পুরুষকে আপন করে নিলে সেও স্ত্রীর জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে তাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে সেই সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত থাকে।
গবেষণায় দেখা যায়, সুখী দম্পতির স্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো থাকে। তাদের রোগ বালাই এর আশঙ্কাও কম থাকে। আর নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক ভালো না থাকা দম্পতি সব সময় হতাশায় ভোগে। এক সময় ঝগড়া বিবাদ এড়াতে পরস্পর একটা দূরত্ব তৈরি করে। স্বামী যতোটুকু সম্ভব বাইরে থাকার চেষ্টা করে।

৫) স্বামীকে সম্মান ও আনুগত্য করা : প্রত্যেক স্ত্রীর উচিত তার স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা ও আল্লাহ নিষেধ করেননি এমন সকল বৈধ বিষয়ে তার আনুগত্য করা। হাদিসে এসেছে,
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه ُ

কুতায়বা (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন মহিলা উত্তম? তিনি বললেনঃ যে মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তা সম্পন্ন করে, এবং তার বাড়ীর ও তার মালের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে, সে তার বিরোধিতা করে।

(সুনানে নাসায়ী ৩২৩৪.মিশকাত ৩২৭২, সহীহাহ ১৮৩৮।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْه-ُ

“যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ’লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকেও আহবান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।” (ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৩; সহীহাহ হা/১২০৩।)

নারীদের পক্ষ থেকে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. নবীজীর দরবারে গিয়ে আরয করেন, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আগমন করেছি। (আল্লাহর রাসূল!) আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেই। সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (তাদের লালন-পালন করি) আমাদের উপর (বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফযীলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামায আদায় করে। রোগী দেখতে যায়। জানাযায় শরীক হয়। একের পর এক হজ্ব করে। সবচেয়ে বড় ফযীলতের ব্যাপার হল তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কীভাবে তাদের মত ফযীলত ও সাওয়াব লাভ করতে পারব?। নবীজী তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দ্বীনী বিষয়ে তোমরা কি কোনো নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনো? এরপর নবীজী সে নারীকে লক্ষ করে বললেন, তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন কর এবং অন্যান্য মহিলাদেরও একথা জানিয়ে দাও যে, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা এসকল আমলের সমতুল্য সাওয়াব

ও মর্যাদা রাখে। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৬৯; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৫২০৯।

চার মাযহাব সম্বলীত সর্ব বৃহৎ ফেক্বাহী গ্রন্থ 'আল-মাওসু'আতুল ফেক্বহিয়্যায়' রয়েছে, "طاعة المخلوقين - ممّن تجب طاعتهم – كالوالدين ، والزّوج ، وولاة الأمر : فإنّ وجوب طاعتهم مقيّد بأن لا يكون في معصية ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " انتهى
যাদের আদেশ-নিষেধ এর অনুসরণ শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব।যেমন-মাতাপিতা,স্বামী,সরকারী বিধিনিষেধ,এর অনুসরণ ওয়াজিব।
এ হুকুম ব্যাপক হারে প্রযোজ্য হবে না বরং ঐ সময়-ই প্রযোজ্য হবে যখন তা গুনাহের কাজ হবে না।কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের অনুসরণ করা যাবে না।(২৮/৩২৭)

স্বামীর বৈধ আনুগত্যে অশেষ সওয়াব রয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»
“কোন মহিলা যদি রীতি মতো পাঁচ বেলা সালাত পড়ে, রামাদানের সাওম পালন করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে; উপরন্তু তার স্বামীর আনুগত্য করে তা হলে সে জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে চায় ঢুকতে পারবে”। (সহীহুত তারগীবী ওয়াত তারহীবী, হাদীস নং ১৯৩১)।

৫) স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া : স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্য তলব করলে স্ত্রীর জন্য তৎক্ষনাৎ স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। শরয়ী ওযর ব্যতীত জবাব না দেয়ার কোনো অপশন নেই।
হযরত আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»
রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশ্তাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা‘নত দিতে থাকে।(সহীহ বুখারী-৩২৩৭)

দৈহিক সম্পর্কের হক উভয়েরই আছে। বিয়ে করা অতঃপর বিয়ের মাধ্যমে একে অন্যর জন্য হালাল হওয়া এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ফায়দা গ্রহণ করা, উপভোগ করা, আল্লাহ তা'আলা অপূরণন্ত এক নিয়মাত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।(সূরা রূম-২১)

স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকবে, জীবনে ও মরণে। এজন্যই তো এ প্রবিত্র বিবাহের আয়োজন। বরং এ পদ্ধতি অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসবাস করা মানবসভ্যতায় আদিকাল থেকে চলে আসছে। স্ত্রীর সাথে একান্ত সময় অতিবাহিত করা ও স্ত্রীর সকল সমস্যাকে নিজ দায়িত্বে সমাধান করে দেয়া একজন স্বামীর উপর শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব।

কেননা আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বসবাসের আদেশ দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।(সূরা নিসা-১৯)

আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন,

حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟»، فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل

حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله»، فشددت، فشدد علي قلت: يا رسول الله إني أجد قوة قال: «فصم صيام نبي الله داود عليه السلام [ص: ٤٠] ، ولا تزد عليه»، قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: «نصف الدهر»، فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ হে ‘আবদুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সওম পালন কর এবং সারা রাত সালাত আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক (শুনেছেন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ এরূপ করবে না (বরং মাঝে মাঝে) সওম পালন কর আবার ছেড়েও দাও। (রাতে) সালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হাক্ব রয়েছে, তোমার চোখের হাক্ব রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হাক্ব আছে, তোমার মেহমানের হাক্ব আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সওম পালন কর। কেননা নেক ‘আমলের বদলে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের সওম হয়ে যায়। আমি (বললাম) আমি এর চেয়েও কঠোর ‘আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন ‘আমলের অনুমতি দেয়া হল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আরো বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেনঃ তবে আল্লাহর নাবী দাঊদ (আঃ)-এর সওম পালন কর, এর হতে বেশি করতে যেয়ো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নাবী দাঊদ (আঃ)-এর সওম কেমন? তিনি বললেনঃ অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত রুখসত (সহজতর বিধান) কবূল করে নিতাম! সহীহ বুখারী(শামেলা)-১৯৭৫
(১১৩১, মুসলিম ১৩/৩৩৫, হাঃ ১১৫৯, আহমাদ ৬৭৭৩)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উপর অনেক হক রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হল,সহবাসের হক। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্বামীর হক বিষয়ে তো জানলাম এখানে স্ত্রীর হক কতটুকু?
এ সম্পর্কে উলামাদের কাছ থেকে বিরোধপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায়।
(ক)
ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহ বলেন,

ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته ، .. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد"

স্ত্রীর সন্তুষ্টি পর্যন্ত স্বামীর উপর স্ত্রীকে সহবাস করা ওয়াজিব(অর্থাৎ স্ত্রীর চাওয়া মাত্র স্বামীকে সহবাস করতে হবে)।যতক্ষণ না স্বামীর শরীর দুর্বল হচ্ছে বা স্বামীকে তার জীবিকানির্বাহ পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সহবাসের পরিমাণ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হলে এক্ষেত্রে উচিৎ খোরপোষ ইত্যাদির মত সহবাসের পরিমাণকে বিচারক ঠিক করে দেবেন।(দৈনিক না সাপ্তাহিক? এইভাবে ঠিক করে দিবেন) ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ-২৪৬

(খ)

জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন,প্রতি চার মাসে একবার স্বামীর উপর স্ত্রীকে সহবাস করা ওয়াজিব।(যখন স্ত্রী তা চাইবে) সে সম্পর্কে ইবনে আবেদীন শামী রাহ, লিখেন..

স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সহবাস, সুতরাং স্ত্রীর সাথে স্বামী কতদিন পর্যন্ত সহবাস না করে থাকতে পারবে সে বিষয়ে আলোকপাত করে বলেনঃ

وَيَجِبُ أَنْ لَا يَبْلُغَ بِهِ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ إلَّا بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا بِهِ. اهـ

স্ত্রীর সন্তুষ্টি ব্যতীত স্বামী মুদ্দতে ই'লা তথা চার মাস এর বেশী সময় সহবাস ব্যতীত থাকতে পারবে না।অন্যকথায় চার মাসের ভিতরে স্ত্রীর সাথে একবার সহবাস করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।তবে স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা সহবাস ব্যতীত স্বামী থাকতে পারবে।

ইবনে আবেদীন শামী রাহ আরো বলেনঃ

وَفِي الْبَدَائِعِ: لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْوَطْءِ لِأَنَّ حِلَّهُ لَهَا حَقُّهَا، كَمَا أَنَّ حِلَّهَا لَهُ حَقُّهُ، وَإِذَا طَالَبَتْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ مَرَّةً وَالزِّيَادَةُ تَجِبُ دِيَانَةً لَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ. اهـ

বাদায়েয়ুস সানায়ে কিতাবে বর্ণিত আছে,সহবাস চাওয়ার অধিকার স্ত্রীরও রয়েছে,কেননা স্বামী উক্ত স্ত্রীর জন্য হালাল হওয়াটা স্ত্রীর অধিকারের অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হওয়াটা স্বামীর অধিকারের অন্তর্ভূক্ত হয়।সুতরাং যখন স্ত্রী স্বামীর কাছে সহবাসকে তলব করবে,তখন জবাব দেয়াটা স্বামীর উপর ওয়াজিব।এমনকি প্রথম একবারের জন্য স্বামীকে কোর্ট বিচারের মাধ্যমে মজবুর(নিরুপায়) করা হবে । এবং একবাবের বেশী সহবাস সম্পর্কে কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামদের মতে দিয়নাতান ওয়াজিব করে থাকেন।(এবং তাও অাবশ্যকীয়)আর কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামদের মতে বৈচারিক তথা কোর্ট বিচারের মাধ্যমে দাবী করাও ওয়াজিব হবে।{রদ্দুল মুহতার;৩/২০৩}

ইবনে আবেদীন শামী রাহ আরো একটু এগিয়ে লিখেনঃ

চার মাসের ভিতর কমপক্ষে একবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা ওয়াজিব তা বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি উমর রাযি এর নিম্নোক্ত নির্দেশনামা উল্লেখ করে লিখেন,

وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَمَّا سَمِعَ فِي اللَّيْلِ امْرَأَةً تَقُولُ: فَوَاَللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ تُخْشَى عَوَاقِبُهُ لَزُحْزِحَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا زَوْجُهَا فِي الْجِهَادِ، فَسَأَلَ بِنْتَه حَفْصَةَ: كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ: فَقَالَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ الْمُتَزَوِّجُ عَنْ أَهْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ زِيَادَةُ مُضَارَّةٍ بِهَا لَمَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِرَاقَ بِالْإِيلَاءِ فِيهَا.

অনুবাদঃউমর রাযি রাত্রে একদিন এক মহিলাকে বিরহের কবিতা গাইতে শুনলেন,যে কবিতার মাধ্যমে সে বলতেছিলো.....

"আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর শাস্তির ভয় না থাকতো,তাহলে এখন আমার খাটের চারপাশ প্রকম্পিত হতো"।

উমর রাযি ঐ মহিলাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন,তখন ঐ মহিলা জানালো যে তার স্বামী বর্তমানে জিহাদে আছে,তখন উমর রাযি উনার মেয়ে হাফসা রাযি কে জিজ্ঞাসা করলেন,একজন মহিলা স্বামী ব্যতীত কতদিন পর্যন্ত সবর করতে পারে?

হাফসা রাযি বললেনঃ চার মাস। এর পর সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের কাছে সংবাদ প্রেরণ করলেন,কোনো বিবাহিত মুজাহিদ সেনা যেন চার মাসের বেশী সময় নিজ পরিবার(স্ত্রী) থেকে দূরে না থাকে। (অতঃপর ইবনে আবেদীন শামী রাহ আরেকটি কিয়াস উল্লেখ করে বলেনঃ) তাছাড়া যদি সহবাস ব্যতীত চার মাস কষ্টকর না হতো,তাহলে কেন আল্লাহ ই'লা (চার মাস সহবাস না করার শপথ করা) এর কারণে বৈবাহিক সম্পর্ককে বিচ্ছেদযোগ্য করবেন।{রদ্দুল মুহতার;৩/২০৩}

আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে বিশেষকরে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে,আপন স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে(সূরা নিসা-১৯)। স্ত্রীর সকল হাজত পূর্ণ করা এই সদ্ব্যবহারের আওতাধীন।
সুতরাং যেভাবে স্বামীর আহবানে সাড়া দেয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। ঠিক তেমনি স্ত্রীর আহবানেও সাড়া দেয়া স্বামীর জন্য উচিৎ ও তার নৈতিক দায়িত্বের আওতাধীন। যদিও সাধারণ পরিস্থিতিতে ওয়াজিবের হুকুম আরোপিত হয় না।
কিন্তু যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, স্বামী সাড়া না দিলে, স্ত্রী গোনাহে পতিত হতে পারে,এমন সম্ভাবনা রয়েছে অনদিকে স্বামীর শরয়ী কোনো উযরও নেই,তাহলে এমন পরিস্থিতিতে স্বামীর জন্যও সাড়া দেয়া দিয়ানাতান তথা নৈতিকভাবে ওয়াজিব হবে।(দিয়ানাতান এর অর্থ হল, এমন হক যে হকের ইস্যু তৈরী করে কোর্টে বিচার দায়ের করা যায় না)

হযরত উমর রাযি নিজ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে,একজন স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গহীন ভাবে কতদিন ধর্য্য ধরতে পারে? উত্তরে উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা রাযি চার মাসের কথা বলেছিলেন। সুতরাং এথেকে বুঝা গেল যে,স্ত্রীর ধর্য্যহীন পরিস্থিতিতে স্বামীর জন্য স্ত্রীর ডাকে সাড়া দেয়া স্বামীর উপর নৈতিক ওয়াজিব। স্বামী পাশে থাকাবস্থায় সহবাসহীন থাকা স্ত্রীর হয়তো এক দিন/সাপ্তাহও অসম্ভব হতে পারে? তাই স্বামীর শারীরিক সক্ষমতা থাকাবস্থায় স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়ে স্ত্রীর প্রয়োজনকে পূর্ণ করা নৈতিকভাবে স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।
জিহাদ বা এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ শরয়ী উযরের কারণের স্বামী তার স্ত্রী থেকে সর্বোচ্ছ চার মাস পর্যন্ত দূরে থাকতে পারবে। কিন্তু বিশেষ কোনো উযর না থাকলে

স্বামীর শারিরিক সক্ষমতা এবং শারিরিকভাবে উদ্যোমী ও উৎফল্ল থাকাবস্থায় স্ত্রীকে পরিতৃপ্ত করা পর্যন্ত স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়া স্বামীর উপর নৈতিকভাবে ওয়াজিব।

প্রশ্ন হতে পারে,

যেভাবে স্বামীর ডাকে স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয় সেভাবে কেন স্ত্রীর ডাকে স্বামীকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয় না? কেনইবা দিয়ানাতান ওয়াজিব বলা হয়?

উত্তরে বলা হবে যে,

স্ত্রীকে আল্লাহ এমনভাবে তৈরী করেছেন যে,সে যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে পারে। এক্ষেত্রে সে শরীরিকভাবে উদ্যোমী থাকুক বা নাই থাকুক,সে পারে। কিন্তু স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে তৈরী করেছেন যে,তার শারীরিক উদ্যোমতা ও মনে প্রফুল্লতা না থাকলে সে স্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতে পারে না। এজন্যই মূলত এই পার্থক্য। তাছাড়া তার অন্য স্ত্রীও থাকতে পারে বা জিহাদ ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও তার হাতে থাকতে পারে।

৬)স্বামীর নাফরমানি না করা : স্বামীর নাফরমানি করা মারাত্নক গুণাহ। এ বিষয়ে হাদিসে কঠোর হুশিয়ারি আছে। আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণেই অধিকাংশ মহিলারা জাহান্নামে যাবে।হাদিসে এসেছে,

ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اطَّلَعْتُ فِيْ الْـجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

"আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর এবং জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা"। (বুখারী ৩২৪১; মুসলিম ২৭৩৮)

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ.

"হে মহিলারা! তোমরা (বেশি বেশি) সাদাকা করো। কারণ, আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখেছি। মহিলারা বললো: কেন হে আল্লাহ্'র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা বেশি লা'নত করে থাকো এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করো না''। (বুখারী ৩০৪; মুসলিম ৮০)

কোন মহিলা তার স্বামীর অবদানসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কখনো সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِيْ عَنْه.ُ

''আল্লাহ্ তা'আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; অথচ সে তার স্বামীর প্রতি সর্বদাই মুখাপেক্ষিণী''। (নাসায়ী/'ইশ্রাতুন্ নিসা', হাদীস ২৪৯, ২৫০; হা'কিম ২/১৯০ বায়হাক্বী ৭/২৯৪ খতীব ৯/৪৪৮)

কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী তথা 'হূররা সে মহিলাকে তিরস্কার করতে থাকে।

মু'আয বিন্ জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْـحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

''কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীরা বলে: তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক! কারণ, সে তো তোমার কাছে কিছু দিনের জন্য। বেশি দেরি নয় যে, সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে''। (ইব্নু মাজাহ্ ২০৪৪)

৭) স্বামীর রাগের সময়ে স্ত্রী বিনম্র হওয়া : স্বামীর স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক হলেও এখানে রাগ-অভিমানো থাকে। কখনো কোনো কারনে স্বামী রেগে গেলে স্ত্রীর উচিত চুপ থাকা ও নম্রতা অবলম্বন করা। স্ত্রীর মাথায় রাখতে হবে যে আদর করে সে শাসনো করতে পারে। মা-বাবাও আমাদের শাসন করেছেন। তার থেকে বেশি আদর করেছেন। বিয়ের পরে স্বামী যেমন আদর সোহাগে রাগেন তেমনি কোনো কারনে শাসন করতেও পারেন। তাই এটাকে খারাপ ভাবে নেয়া যাবেনা। ভুল করলে তার

কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি তার ভুল না হয়েও থাকে তবুও পরিস্থিতি সামলানোর জন্য ক্ষমা চাওয়া। স্বামী যেহুতু মর্যাদায় বড় তাই তার কাছে ক্ষমা চাওয়া অপমানের কিছু নয়। বরং এটা মহৎ গুণ। অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ নিন্দনীয়। স্বামীর রাগের সময় এমন আচরণ তার রাগকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। রাগের আগুনকে নেভাতে হয় নিরবতার ও বিনয়ের পানি দ্বারা।

হাদিসে এসেছে, নবি করীম (সা.) বলেন, তোমাদের স্ত্রী রাও জান্নাতি হবে। যে স্ত্রী অধিক প্রেমময়ী, সন্তান দানকারিণী, ভুল করে বারবার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবো না। (বায়হাক্বী, শু'য়াবুল ঈমান হা/৮৩৫৮)

শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে বদ্ধপরিকর। ধোঁকা ও প্ররোচনার নতুন নতুন ফাঁদে আল্লাহর বান্দাদের আটকানোর চেষ্টা করে সে। এ কাজে শয়তান সফল হবে বলে চ্যালেঞ্জ করেছিল আল্লাহর সঙ্গে। মহান আল্লাহও তাকে সুযোগ দিলেন। এরপর থেকে পুরো মানবজাতীর বিরুদ্ধে তার শয়তানি কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে।

কোরআনুল কারিমে শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও; আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা বাকারা: ২০৮)

মানুষকে ফাঁদে আটকিয়ে গুনাহের কাজ করাতে পারলেই শয়তান খুশি। কিছু গুনাহ শয়তানকে বেশি আনন্দ দেয়, আর কিছু কম। শয়তানের কাছে পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট করার চেয়ে বড় খুশির খবর নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়েবিচ্ছেদ ঘটলে তার আনন্দের সীমা থাকে না।

তেমনই এক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে হাদিসে। হজরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, ‘শয়তান পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে, তারপর (পুরো বিশ্বে) তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। আর (ওই শয়তান সদস্য) তার সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত, যে (মানুষের মাঝে) সবচেয়ে বেশি ফেতনা সৃষ্টি করে। শয়তান সিংহাসনে বসে সবার ঘটানো ফেতনার বর্ণনা শোনে। একজন এসে বলে

আমি অমুক কাজ করেছি, শয়তান বলে তুমি তেমন কোনো কাজ করোনি। এভাবে শয়তান তার পাঠানো অন্যদের (শয়তান সদস্যদের) মন্দ কাজের বিবরণ শুনতে থাকে। অতঃপর একজন এসে বলে- 'আমি অমুকের সঙ্গে ধোঁকার আচরণ করেছি, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছি। এ (ফেতনার) কথা শুনে শয়তান তাকে তার কাছাকাছি (বুকে) টেনে নেয়। আর বলে- তুমিই বড় কাজ করেছ। হাদিস বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নেয়।' (মুসলিম: ৭২৮৪; আহমদ: ১৪৩৭৭)

৮) অযথা অভিযোগ এড়িয়ে চলা : জিবনে সমস্যা ও অভিযোগ নেই এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রত্যেকেই তার সমস্যাগুলো তার কাছের মানুষকে বলতে ভালোবাসে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেক কাজের সুনির্ধারিত সময় ও উপযুক্ত জায়গা আছে। তাই অভিযোগ করার উপযুক্ত সময় এবং পরিস্থিতি খুঁজে নেওয়া উচিত। সারা দিনের পরিশ্রমে স্বামী খুব ক্লান্ত ও নার্ভাস থাকলেও অনেক বোকা ও স্বার্থপর নারীরা তা বুঝতে পারেনা। স্বামীর প্রফুল্লতা ফিরে আসার অপেক্ষা না করে তারা অভিযোগের অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করতে শুরু করে। বলতে থাকে-তোমার বাচ্চারা আজ সারাদিন জালিয়েছে, তোমার মা-বোন আমার সাথে এই এই করেছে ইত্যাদি। স্বামী বাড়িতে আসার সাথে সাথে এরকম অভিযোগ করা ভুল। তিনি কর্মস্থলে নানা ঘটনার সম্মুখীন হোন। নানান কাজের চাপ তিনি অনেক ক্লান্ত হয়ে পরেন। বাড়িতে আসার পর তাকে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে এমন অভিযোগ করা ভুল। অসময়ে এমন অভিযোগের অভ্যাস আল্লাহর জন্য বাদ দিতে হবে। উপযুক্ত সময় বের করে প্রয়োজনে বলতে হবে। সম্ভব হলে বিষয়গুলে না বলা। তবে যদি এমন হয়যে সমস্যার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে তাহলে পরামর্শের নিমিত্তে তাকে উপযুক্ত সময়ে বলা। যে বিষয়গুলো এমন এমন। আসলে আমার কি করণীয়। কিভাবে কি করলে সমাধান পাওয়া যাবে। আমি একা আসলে বুঝতেছিনা। তাহলে দেখবেন আপনার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস, ভালোবাসা বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এক চিকিৎসক আদালতে বলেছিলেন - আমি বিবাহিত জীবনে কখনো আমার স্ত্রীকে উপযুক্ত গৃহবধূ রূপে দেখিনি। আমাদের ঘর সর্বদা জঞ্জাল হয়ে থাকে। সব সময় সে বিকট স্বরে গালাগালি করে। তার প্রতি আমি খুবই বিরক্ত। তাকে এক কাড়ি টাকা

দেওয়ার পরে আমি বিচ্ছেদ পেয়েছিলাম। তিনি আনন্দের সাথে বলেছিলেন, সে যদি আমার সমস্ত সম্পদ এমনকি আমার মেডিকেল ডিগ্রী ও চাইত তবুও আমি তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সব তার হাতে তুলে দিতাম।

কত জঘণ্য পরিস্থিতি। এমন স্বামীরা আত্নবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে,জিবনকে অর্থহীন ভাবে। আর এই মনোভাব মস্তিষ্ক থেকে সাধারণত মুছা যায় না। ফলে এমন ব্যক্তিরা বন্ধু-বান্ধবের সাথে খুব কম মিশে, মানুষের সাথে কথাবার্তা কম বলে। আর তখন বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ উদ্বেগ ও শূন্যতার বিরূপ প্রভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। এমন ব্যক্তিরা জীবনের সেই হারিয়ে ফেলে, সব সময় মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে।

তাই অযথা অসময়ে অভিযোগের অভ্যাস জিবন থেকে বাদ দিতে হবে।

৯) বিশ্বস্ত ও প্রশান্ত মনোভাবের অধিকারী হওয়া : স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরশীল। সকল সম্পর্কের মাঝে বিশ্বস্ত ও প্রশান্ত মনোভাব অপরিহার্য। তবে দাম্পত্য জীবনে এটি অধিক অপরিহার্য। দাম্পত্য জিবন যেহুতু সম্মিলিত জীবন, এই সম্মিলিত জীবনে প্রফুল্ল মন নিয়ে একসাথে থাকতে হবে,একসাথে বাঁচতে হবে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী জীবনযাপন করতে চাইলে উদার ও ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। ঝগড়াটে মনোভাব পরিহার করতে হবে। একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। দুজনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার সুসম্পর্ক রাখার অন্যতম হাতিয়ার। আর সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণ দুজনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। বিবাহ বিচ্ছেদের পরিসংখ্যান গুলো থেকে বিষয়টি স্পষ্ট।

একজন মহিলা আদালতে অভিযোগ করেছিলেন, তার স্বামী সব সময় দুপুর ও রাতের খাবার বাইরে খেতে যান। স্বামী তখন বাইরে খেতে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তার স্ত্রী মোটেও স্বাভাবিক নয়। সে চরম পর্যায়ের মস্তিষ্ক বিকৃত। এই কথা শুনে স্ত্রী তাৎক্ষণিক ছুটে গিয়ে বিচারকের সামনেই স্বামীকে মারতে শুরু করে। এ নির্বোধ মহিলা ভেবেছিল অভিযোগ, গালি গালাজ আর মারধর করার মাধ্যমে সে স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাই সে সহজ ও বুদ্ধিদীপ্ত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। অথচ সেটাই হতো সঠিক পদক্ষেপ। তারা দুজনে উপযুক্ত আচরণ করতে ভুল করেছে।

বেশিরভাগ পারিবারিক সমস্যার মূল কারণ অবিশ্বাস ও কোমল স্বভাবের না হওয়া। তাই উভয়কেই এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, যে স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দেয় সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়। এবং যে তার স্বামীকে সম্মান করে, স্বামীর আনুগত্য করে এবং তাকে কোন দুঃখ দেয় না সে ধন্য এবং সমৃদ্ধ।

হাদিসে আছে - মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন মহিলার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল যে অধিক নামাজ রোজা ও সদকার কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। তবে সেটা রুক্ষ আচরণ দিয়ে সঙ্গীদেরকে কষ্ট দিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়স সাল্লাম বলেন, সে জাহান্নামের বাসিন্দা। (মুসনাদে আহমদ হা/ ৯৬৭৫)

১০) মিতব্যয়ী হওয়া ও অল্পে তুষ্ট থাকা :সাংসারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে মিতব্যয়িতা ও অল্পে তুষ্টি অত্যন্ত কার্যকর চাবিকাঠি। অহেতুক খরচ কমালে সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, অল্পে তুষ্ট থাকলে মানসিক শান্তি বজায় থাকে, জীবনে কোনো অতৃপ্তি বা হতাশা থাকে না এবং পারিবারিক অশান্তি দূর হয়। যেসকল নারীরা অপচয় করে এবং কখনো কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারেনা তারা কখনই নিজেরা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারেনা। তারা সবসময় শুধু টাকা চায়। কারন তারা ভাবে টাকাই সব সমস্যার সমাধান করবে। তাদের কাড়ি কাড়ি টাকা লাগবে যা দিয়ে তারা ইচ্ছামতো খরচ করবে। তারা দাসের মতো স্বামী চায়, যারা তাদের কথা মতো সেবা করবে এবং তাদের ব্যয়ে কখনো বাধা দিবেনা। এসব মহিলারা নারী জাতের কলঙ্ক। তাদের সংসার টিকেনা। টিকলেও সেই সংসার কখনো সুখের হয়না। তাদের ছেলেমেয়েদেরো এই মায়েরা শান্তি দিতে পারেনা। তার ছেলে বড় হয়ে ইনকাম করলে তাদের কাছে সবসময় টাকার দাবি করে। যা অনেক সময় বউ-শাশুড়ির সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলে। তাই লোভী না হয়ে অল্পে তুষ্ট হতে হবে। অন্যের অনুকরণ ছেড়ে নিজের পরিবারের সমৃদ্ধি ও স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যদি স্বামীও এরকম লাগামহীন ব্যয়ে অভ্যস্ত হয় তাহলে তাকেও বুঝাতে হবে।

এক বর্ণনায় আছে- নবী করীম (সা.) নারীদের কাছ থেকে স্বামীকে ধোকা না দেওয়ার ওয়াদা নিয়েছেন। জিজ্ঞেস করা হলো - স্বামীকে ধোকা দেওয়ার অর্থ কী? জবাবে

তিনি বললেন- 'অনুমতি ছাড়া স্বামীর মাল ব্যয় করে অন্যের সাথে খাতির জমানো।' (আহমাদ হা/২৭১৩৩)

আরেক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'তাকওয়ার পরে মুমিন বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হলো, নেককার স্ত্রী। যে স্বামীর আদেশ অমান্য করে না, এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজের সতীত্বের হেফাজত করে।' (ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৭)।

১১) স্বামীর প্রশংসা করা : বিয়ের আগে মা-বাবা তাদের জীবন দিয়ে হলেও তার সন্তানদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করে আর বিয়ের পরে স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভালো রাখার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। তিনি হয়তো কাজের চাপে এক বেলা খাওয়ারে সুযোগ পাননা। তাই তাঁকে এবং তার কাজকে সম্মান করুন। তিনি আপনার এবং পরিবারের জন্য যা কিছুই করে তার প্রশংসা করুন, তাঁকে ভালো কাজে উৎসাহ দিন। তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করুন। যদি তিনি অবমূল্যায়ন পান তাহলে তিনি পরিবারের মঙ্গলের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যাবেন, উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। আপনার জন্য করা প্রতিটি কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। প্রশংসা করলে কেউ ছোট হয়না। আপনার প্রশংসার জন্য আপনার স্বামী আপনাকে আরো দ্বীগুণ ভালোবাসবে। তবে অনেক নারী আছে স্বামী তার জন্য জান-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে কিছু করলেও সে অল্পতেই দূর্নাম করে।

হাদিসে আছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। কারণ জানতে চাইলে নবীজি বললেন -
কারণ তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ, অল্পতেই তারা অনুগ্রহ ভুলে যায়, সারা জীবন স্বামী তার যথাযথ খেয়াল রাখার পরও কখনো এর ব্যতিক্রম হয়ে গেলে তারা বলতে শুরু করে, জীবনে কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু পাইনি। (বুখারী হা/২৯)

আরেক বর্ণনায় আছে,
যখন কোন নারী তার স্বামীকে বলে জীবনে কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু পায়নি তখন তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। (ইবনে আদি হা/৭৭৯)

বিখ্যাত তাবেয়ি হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব এর কাছে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করলে তিনি বলেন - নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
যে নারী স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

১২) স্বামীর দোষ না ধরা : পৃথিবীতে কেউ নিঁখুত নয়। কিছুনা কিছু সমস্যা মানুষের থাকবেই। কেউ মোটা কেউ চিকন, কেউ লম্বা কেউবা খাটো,কারো নাক বড় কারো নাক ছোট, কেউ কম কথা বলে কেউবা বাচাল, কেউ কম খায় কেউবা বেশি খায় ইত্যাদি সমস্যা মানুষের থাকেই। এসব সমস্যা কারো স্বামীর মাঝে থাকলে তাকে এগুলো নিয়ে দোষ দেওয়া যাবেনা যে তোমার এই এই সমস্যা। জীবনসঙ্গীর ভালোমন্দ উভয় নিয়েই মানিয়ে নিতে হয়। নিজের স্বামীকে নিখুঁত মনে করে এমন কোন মহিলা বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ তার স্বামীর দোষত্রুটি অন্বেষণ করলে কিছু না কিছু দোষ খুঁজে পাবেই। তাই বলে কখনো এসব নিয়ে স্বামীকে ছোট করা যাবেনা। তেমনি স্বামীও করবেনা। কখনো স্ত্রী নিজের স্বামীকে অন্য পুরুষের সাথে তুলনা করবেনা। কখনো এটাও বলবেনা আমিতো এমন স্বামী চেয়েছিলাম। তুমি আমার মন মতো হওনি। নিজের স্বামী যেমনি হোক তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ মনে করতে হবে। নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে হবে। অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবেনা। এটি হারাম। যারা অন্য পুরুষের সাথে নিজের স্বামীকে তুলনা করে তারা একসময় নিজেকে দুর্ভাগা মনে করে। তারা ভাবে তার স্বামীতো তার স্বপ্নের পুরুষের মতো না। সেতো এমন এমন গুণ চেয়েছিলো। সেতো এমন নয়। কিভাবে তার সাথে এক ছাদের নিচে থাকা যায় । এমন ভাবতে ভাবতে অনেকে নিজের স্বামীকে প্রকাশ্যে ছোট করা শুরু করে। স্বামী ধৈর্যশীল হলে শুরুতে ধৈর্য ধরলেও একসময় আর তাদের মাঝে আর সম্পর্ক ভালো থাকেনা। তাদের মাঝে এসব নিয়ে তর্ক হয়। এক পর্যায়ে তারা ডিভোর্সেও চলে যেতে পারে। ডিভোর্সের পরে যে কেউ মন মতো স্বামী পাবে এমনটাও না। তাই ডিভোর্স দিবে নাকি কষ্ট করে সংসার করবে এটা শতবার ভাবা উচিত। নিম্নে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

"এক নারী স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কারণ তার স্বামী থেকে নাকি দুর্গন্ধ আসে । এই সমস্যার সমাধান না হলে সে বাড়িতে ফিরবে না বলে জানিয়ে দেয় ।

স্বামীর অনুরোধের ভিত্তিতে আদালত তাদেরকে পুনরায় মিল করে দেয় এবং স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে আসে । যখন তারা বাসায় পৌঁছে মেয়েটি তখনও ওই দুর্গন্ধ পেতে থাকে । তাই সে অন্য রুমে চলে যায় ।এভাবে চলতে থাকায় এক পর্যায়ে তার স্বামী পাগল হয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।"

"একজন মহিলা দন্ত্যচিকিৎসকের স্বামী তার তিন বছর পরে স্নাতক পাস করার কারণে সে স্বামীকে তালাক দিয়ে দেয় । কারণ স্বামী নাকি তার যোগ্য নয়।"

"একজন মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করার কারণ ছিল তার স্বামী মেঝেতে বসে হাতে নিয়ে খাবার খেতো। প্রতিদিন শেভ করত না আর অন্যদের সাথে সামাজিকভাবে চলতো না ।

যেখানে আমি নিজে নিখুঁত নই সেখানে একজন নিখুঁত স্বামী পাওয়ার স্বপ্ন কিভাবে দেখব ? যদিও আমি নিজেকে নিখুঁত মনে করি তবুও অন্যের কাছে গেলে দেখা যাবে আমার কিছু না কিছু সমস্যা আছেই । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করছো কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই, তারা মন দিয়ে শোনো, মুসলমানদের সমালোচনা করো না, তাদের দোষ খুঁজতে যেও না । যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ তায়ালা তার দোষ খোঁজেন । আল্লাহ যার দোষ খোঁজেন সে নিজের ঘরে বসে থেকেও লাঞ্ছিত হয় ।

১৩) স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়া : স্বামী অপছন্দ করে এমন কোন লোককে বাড়িতে বা নিজের কাছে প্রবেশ করতে দেওয়া স্ত্রীর জন্য উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে তোমরা যাদেরকে পছন্দ করো না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা না মাড়ায়। (মুসলিম হা/১২১৮)
অন্যত্র তিনি বলেন , স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না। (বুখারী হা/৫১৯৫)

১৪) স্বামীর অনুমতি ব্যতিত নফল সিয়াম না রাখা : স্বামী- স্ত্রী এক সাথে থাকলে যেহেতু স্ত্রী নফল রোজা রাখলে স্বামীর হক পালনে ত্রুটি আসতে পারে। আবার স্বামীর সহবাসেও বাঁধা আসতে পারে। তাই শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ। তবে যদি স্বামী দূরে থাকে সে ক্ষেত্রে নফল রোজা রাখলে স্বামীর হক পালনে ত্রুটি আসার সম্ভবনাই নেই। তাই স্বামী দূরে থাকলে স্ত্রীর জন্য নফল রোজা রাখার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নেওয়া জরুরী নয়। তবে এ ক্ষেত্রেও অনুমতি নেওয়া উত্তম।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ صحيح

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়া স্ত্রী রমাযান মাসের সওম ব্যতীত নফল সওম রাখবে না এবং তার উপস্থিতিতে তার সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার ঘরে আসার অনুমতি দিবে না।
(বুখারী,মুসলিম,আবু দাউদ ২৪৫৮)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ، يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، فَلَا أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَوْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ صحيح

আবূ সাঈদ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তাঁর কাছে এক মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল যখন আমি সালাত আদায় করি তখন আমাকে প্রহার করে। আমি সওম রাখলে সে আমাকে সওম ভঙ্গ করা এবং সূর্য উঠার পূর্বে সে ফজরের সালাত আদায় করে না।

বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে সাফওয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছে সে সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অভিযোগ হলো, 'আমি যখন সালাত আদায় করি সে আমাকে প্রহার করে', কারণ হচ্ছে, সে এমন দু'টি দীর্ঘ সূরা দিয়ে সালাত আদায় করে যা পাঠ করতে আমি তাকে নিষেধ করি।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেনঃ (ফাতিহার পর) সংক্ষিপ্ত একটি সূরাই লোকদের জন্য যথেষ্ট। তার অভিযোগ, 'আমাকে সওম ভাঙ্গতে বাধ্য করে', ব্যাপার এই যে, সে প্রায়ই সওম রাখে। আমি একজন যুবক, ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনই বললেনঃ কোনো নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নফল) সওম রাখবে না। এবং তার অভিযোগ, 'সূর্য উঠার পূর্বে আমি (ফজরের) সালাত আদায় করি না', কারণ হলো, আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদা কাজে (পানি সরবরাহে) ব্যস্ত থাকে। ফলে সূর্য উঠার আগে আমরা ঘুম থেকে জাগতে পারি না। তার কথা শুনে তিনি বললেনঃ যখনই তুমি জাগ্রত হবে তখনই সালাত আদায় করে নিবে।
(সুনানে ইবনে মাজাহ,মুসনাদে আহমাদ,আবু দাউদ ২৪৫৯)

كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها " . رواه الترمذي
আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।''
(তিরমিযি ১১৫৯)

عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر ، لكان نولها أن تفعل

হযরত আঈশা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে আদেশ করে যে লাল পাহাড় কে কালো পাহাড়ে পরিবর্তন করতে বা তার বিপরীত,তাহলে স্ত্রীকে এমন কাজই করতে হবে।
(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নং হাদীস ১৩৩-১৩৪ নং পৃষ্ঠা)

,

১৫) স্বামীর অনুমতি ব্যতিত বাড়ির বাইরে না যাওয়া : স্ত্রীর জন্য জরুরি হল, বিশেষ কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে স্বামীর নিকট অনুমতি নেয়া। স্বামী অনুমতি দিলে পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে এবং নিজেকে ফিতনা থেকে হেফাযতে রেখে স্ত্রী বাইরে যেতে পারে। দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে অবশ্যই তার পিতা, ভাই ইত্যাদি মাহরাম পুরুষের সাথে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি তাকে যেতে নিষেধ করে তাহলে স্ত্রীর জন্য তা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়। অন্যথায় সে স্বামীর 'অবাধ্য' হিসেবে গণ্য হবে এবং গুনাহগার হবে।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী হা/৪৭৯৫)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا
"আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবীর পরিবার!

আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।" (সুরা আহযাব : আয়াত ৩৩)।

১৬) স্বামীর পরিবারের উত্তম সংরক্ষক হওয়া : একজন স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর পরিবারের উত্তম সংরক্ষক হতে হবে । স্বামী সবসময় বাড়িতে থাকেননা । জীবিকার তাগিদে তাকে বাইরে যেতে হয়। কখনো মাসের পর মাস বাইরে থাকা লাগে । স্ত্রীর উচিত স্বামীর পরিবারের দায়িত্ব যথাযথ পালন করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের সংরক্ষণ করা । প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অপচয় না করা । সম্পদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর তুমি মোটেই অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই । আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ । (সুরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৬-২৭)

আর তিনি বলেন, তোমরা খাও এবং পান কর । কিন্তু অপচয় করোনা । নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেননা । (সুরা আরাফ : আয়াত ৩১)

পক্ষান্তরে স্বামীর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে স্ত্রীকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে । রাসূল (সা.) বলেন, নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল । সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে । (বুখারী হা /৭১৩৮)

একজন স্ত্রী হলেন সংসারের কর্ত্রী । স্বামীর ধন-সম্পদ ও সংসার তার রাজত্ব এবং এগুলো স্বামীর আমানত । তাই তার যথার্থ হেফাজত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা স্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য । স্বামীর সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা ও স্বামীর বিনা অনুমতিতে আত্নীয়-স্বজনকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়াও বৈধ নয় । এসব কারণে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যা স্থায়ী হয়ে অনেক সময় বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায় । অবশ্য স্বামী ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপন হলে এবং স্ত্রী -সন্তানদের প্রয়োজনীয় জিনিস না দিলে স্ত্রী গোপনে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিতে পারবে । (বুখারী হা/৫৩৬৪)

আর স্বামী দানশীল হলে ও দানের জন্য সাধারণ অনুমতি থাকলে স্ত্রী যদি তার অনুপস্থিতিতে দান করে, তাহলে উভয়েই সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে । (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, সহীহ আত-তারগিব হা/৯২৬-৯৩০)।

১৬) শশুর-শাশুড়ির সাথে উত্তম ব্যবহার করা : স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য । বিভিন্ন মাধ্যমে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তার মাঝে অন্যতম উপায় হলো তার মা-বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার দিয়ে। এবং যথাসম্ভব তাদের দেখভাল করা, সেবা-যত্ন করা। স্বামীকেও তার মা-বাবার সেবা-যত্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা। তাহলে স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরী হবে এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন । এতে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আরো মজবুত হবে । স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা বেড়ে যাবে। সর্বাত্নক চেষ্টা করতে হবে শশুর-শাশুড়ি যেনো কষ্ট না পান। তাদেরকে নিজের মা-বাবার মতো সম্মানের চেষ্টা করতে হবে । মনে রাখতে হবে তারা আপনার স্বামীকে জন্ম দিয়েছে । আপনার মা-বাবা যেমন তার ছেলে ও ছেলের বউ এর কাছে সম্মান ও ভালোবাসা চায় তেমনি আপনার শশুর-শাশুড়িও চায় । তাই নিজের মা-বাবার কথা মনে করে নিজের শশুর-শাশুড়িকেও সম্মান করুন । তাদের সাধ্যমতো হাদিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন । মাঝে মাঝে সম্ভব হলে তাদের পছন্দের খাবার রান্না করে খাওয়াবেন বা কিনে খাওয়াবেন । তাদেরকে মান্য করার চেষ্টা করবেন । যদি বাবার বাড়ি থেকে কোনো হাদিয়া আসে তাহলে সেটি তাদের কাছে পেশ করবেন । তারা যা ভালো মনে করবেন তাই দিবেন । তবে এক্ষেত্রে স্বামীকেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে । আপনি শুধু সারাজিবন চেয়ে যাবেন আপনার মা-বাবাকে আপনার স্ত্রী সম্মান দিবে ভালোবাসবে আর আপনি তার মা-বাবাকে সম্মান দিবেননা, কখনো খোঁজ-খবর নিবেননা এমনটি যেনো না হয় । কথায় আছে, ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা পাওয়া যায় । তাই আপনিও সাধ্যমতো আপনার শশুর-শাশুড়ির দেখভাল করবেন। তাহলে তারাও আপনাকে ছেলের মতো ভালোবাসবে ইনশাআল্লাহ ।

.

১৭) শশুরালয়ে অন্যদের সাথে উত্তম আচরণ করা : শশুর -শাশুড়ি ব্যতিত শশুর বাড়িতে ননদ-দেবর, দাদা শশুর-দাদি শাশুড়ি সহ অনেকে থাকতে পারে । তাই তাদের সাথেও উত্তম আচরণ করতে হবে । তাদের কথায় ও আচরণে কষ্ট পেলে যথাসম্ভব সবর করার চেষ্টা করতে হবে । ননদকে নিজের বোনের মতো আদর করার

চেষ্টা করতে হবে । সে যেমনি করুক। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করবেন। বাড়ির মুরুব্বিদের দেখভাল করার চেষ্টা করবেন । তাদের থেকে দুয়া নিবেন । এছাড়া বাড়িতে যারা গায়রে মাহরাম থাকবে তাদের থেকে দূরে থাকবেন । পর্দার লঙ্ঘন করবেননা । হাদিসে এসেছে দেবর মৃত্যু সমতুল্য । অধিক ফেতনার কারণ । তাই তাদের সাথে সরাসরি মেলামেশা,হাসি ঠাট্টা এসব করা যাবেনা । হ্যা তাদের জন্য পর্দার আড়ালে রান্না করে দিতে পারবেন কিন্তু সরাসরি খাবার দেওয়া এসব থেকে দূরে থাকতে হবে । এছাড়া স্বামীর অন্যান্য আত্নীয়দের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবেন। গায়রে মাহরাম হলে পর্দার আড়াল থেকে আপ্যায়ন করবেন । তবে মহিলা আত্নীয় হলে অবশ্যই সরাসরি কথা বলবেন, তাদের সাথে হাসিখুশি ভাবে থাকবেন এবং আপনার সাধ্যমতো ভালোভাবে আপ্যায়ন করবেন। এবং প্রতিবেশীদের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক রাখবেন । মাঝে মাঝে সম্ভব হলে তাদের জন্য খাবার হাদিয়া পাঠাবেন।

১৮) স্বামীর গৃহের কাজ করা : বিয়ের পরে অন্যতম দয়িত্ব হলো স্বামীর গৃহের কাজ করা । স্বামীর গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি রাখা স্ত্রীর কর্তব্য । কেননা পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা হলো সুস্বাস্থের চাবিকাঠি। এটি অসুস্থতা ও বহু রোগের জীবাণুকে প্রতিরোধ করে এবং পরিবারের সদস্যদের পরিচ্ছন্ন গৃহের প্রতি আকৃষ্ট করে । গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এটি একটি পরিবারের আদর্শেরও ধারক ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

পবিত্রতা -পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। (সহিহ মুসলিম হা/২২৩)

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
তোমরা নিজেদের চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখ। আঙ্গিনা অপরিচ্ছন্ন রাখা ইহুদীদের কাজ।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -
নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন । তিনি পরিচ্ছন্ন,পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন । সুতরাং তোমরা আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখো । ইহুদীদের মত হয়ো না । (জামে তিরমিজি হা/২৭৯৯)।
একজন স্ত্রী তার গৃহকে অনেক পরিপাটিভাবে গুছিয়ে রাখবেন । আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখবেন, গৃহের সদস্যদের পোষাক-আশাক সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং যথাস্থানে গুছিয়ে রাখবেন । গৃহকে আকর্ষণীয় ও পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা একজন গৃহিনীর অন্যতম কর্তব্য । একজন বুদ্ধিমান ও রুচিশীল গৃহিনী জানেন কীভাবে একটি গৃহকে সাজাতে হয় ।

স্ত্রীর আরো অন্যতম দায়িত্বগুলো হলো স্বামীর যথার্থ খেদমত করা, সন্তান-সন্ততিদেরকে লালন-পালন করা, তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, তাদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া এবং সভ্য হিসেবে গড়ে তোলাও স্ত্রীর দায়িত্ব । বিয়ের পরে নারীর জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের হকের পর স্বামীর হকের মত অবশ্য কর্তব্য কোনো হক নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
পূণ্যময়ী নারীরা স্বামীর অনুগতা এবং তার অনুপস্থিতিতে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিনী হয় । (সুরা নিসা : আয়াত ৩৪)
সন্তান-সন্ততি লালন-পালন এটাতো স্ত্রীর জন্য আবশ্যক । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদের সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

১৯) খাদ্য প্রস্তুত করা : পরিবারের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাও একজন গৃহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব । একজন ভালো গৃহিণী একই সাথে একজন ভালো রাধুনীও বটে । যিনি স্বল্প ব্যয়ে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করতে সক্ষম । কিন্তু একজন অদক্ষ গৃহিণী দামী ও ভাল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করতে পারেন না । সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমে শশুরালয়ে অনেকের মন জয় করা যায় । বিশেষ করে স্বামীর । সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমে স্বামীকে নিজের দিকে আকর্ষিত করা যায় । স্ত্রীর যদি রান্না ভালো হয় তাহলে স্বামী তৃপ্তি ভরে খান এবং স্ত্রীর প্রশংসা করেন । যা তাদের সম্পর্ককে আরো মধুর করে তোলে । তবে খাবারের গুণগত মানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে । খাবারের পুষ্টিগুণ যেনো নষ্ট না হয় । নাহলে সে খাবার খেয়ে শুধু

পেট ভরবে কিন্তু শরীরে পুষ্টি ও ভিটামিন সরবরাহ করবেনা । গৃহে আত্নীয়স্বজন আসলে তাদের জন্যও সুন্দরভাবে রান্না করে পরিবেশন করতে হবে যেনো তারা খেয়ে তৃপ্তিবোধ করেন ।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব

স্বামী এবং স্ত্রীর প্রত্যেকের আলাদাভাবে যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তেমনি তাদের যৌথভাবেও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। যা তাদের সম্পর্ককে আরো মজবুত করে এবং একটি পরিবারকে গড়ে তোলে আদর্শ পরিবার হিসেবে । নিম্নে তাদের যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হলো -

১) আল্লাহর হকের প্রতি যত্নবান হওয়া : আল্লাহর বান্দা হিসেবে আগে আল্লাহর হক আদায় করতে হবে তারপর পরিবারের হক । কখনো যেনো এমন না হয় বান্দার হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহর হককে ভুল গেলাম । তাহলে সেই পরিবারে কখনো আল্লাহর রহমত নেমে আসবেনা। যদি স্বামী -স্ত্রী নিজেরা আল্লাহর হকের প্রতি অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগির প্রতি যত্নবান হয় তাহলে তাদের সন্তানরাও ছোট থেকে আল্লাহর হকের বিষয়ে যত্নবান হবে। ফলে তারা মা-বাবার হকের বিষয়েও শিখে যাবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও আল্লাহর হকের বিষয়ে সচেতন হবে ইনশাআল্লাহ। ফলশ্রুতিতে সেই পরিবারটি একটি ইসলামী পরিবার হিসেবে গড়ে উঠবে।

২) পরিবারের সদস্যদের দ্বীনি ইলম চর্চা করানো : স্বামী-স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হলো পরিবারের সদস্যদের দ্বীনদারির হালত অবলোকন করা এবং তাদের সে অনুযায়ী পরামর্শ দেওয়া । তাদের ইলমের চর্চার বিষয়ে বুঝানো, শেখানো । তাহলে তারা সহজে কেউ পথভ্রষ্ঠ হবেনা ইনশাআল্লাহ। তাদের ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদাতের হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে শেখানো এবং নফলেও উদ্বুদ্ধ করা । সেই সাথে মাসনুন দুয়া এবং সুন্নাহ গুলো শেখানো, দৈনন্দিনের জন্য ফিকহি মাসআলা শেখানো, হেফাজতের আমলকে সকাল-সন্ধ্যায় আবশ্যকীয় করে দেওয়া, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করানো এবং হাদিসের কিতাব পড়া । সেই সাথে তর্জমা ও তাফসীরেও উদ্বুদ্ধ করানো

। কুরআন সহিহ না থাকলে কুরআন সহিহকরণের প্রতি জোর দেয়া । নিজেদের সময় হলে নিজেরাই শেখানো অথবা উস্তাদ রাখা । দুয়া ও সুন্নাহর এখন বিভিন্ন রকম স্টীকার পাওয়া যায়। সেগুলো দরজায়,দেওয়ালে লাগানো যায় । এমনভাবে লাগানো যেনো একদম ছোট অবুঝ বাচ্চারা যেনো ছিড়ে ফেলতে না পারে। আর বাচ্চারা যেনো ছোট থেকেই দ্বীনি পরিবেশ পায় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে ।
তবে কুরআনে এ বিষয়ে গৃহকর্তাকে বেশি জোড় দিয়েছে । স্ত্রীও যদি দ্বীনদার হয় তাহলে স্বামীকে এ বিষয়ে সাহায্য করাও তার কর্তব্য । কেনোনা তারা হলো একে অপরের সহযোগী । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ দেন, তারা তার অবাধ্য হয় না এবং তারা তা-ই করে যা করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়।" (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬)

এই আয়াতের প্রকৃত দাবি হলো, পরিবারের লোকদের ইলমে দিন শিক্ষা দেওয়া । সঠিক তরবিয়তের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ।

মানুষ তার দায়িত্ব ও কাজের ব্যস্ততার কারণে পরিবারের লোকদের শিক্ষার ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন থাকে । এর সমাধান এভাবে হতে পারে যে , সে সপ্তাহে বা মাসে একটি দিন নির্ধারণ করে রাখবে, যেদিন পরিবারের লোকদের শিক্ষা দীক্ষার কাজে সময় ব্যয় করবে। এমনও হতে পারে যে ঐ দিনটিতে তার নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদেরকেও ইলম শিখাবে। ঐ দিনে অবশ্যই সে নিজে উপস্থিত হবে এবং পরিবারের সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করে দেবে । হাদিসে এসেছে-
আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, কতিপয়ী মহিলা সাহাবী নবী করীম সাঃ কে বলল, পুরুষরা আপনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পরাজিত করেছে। (অর্থাৎ পুরুষরা আপনার কাছ থেকে ইলম শিক্ষার সুযোগ বেশি পাচ্ছে।) অতএব

আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারণ করুন । তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের নিকটে আসার অঙ্গীকার করলেন । অতঃপর তিনি (নির্দিষ্ট দিনে) তাদেরকে নসিহত করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন । (বুখারী হা/১০১)।

৩) বাড়িতে ইসলামী বইয়ের একটা লাইব্রেরী তৈরী করা : একটি ইসলামী পরিবারের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো ঘরে ইসলামী লাইব্রেরি থাকবে । আর এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে করার চেষ্টা করবে। এই লাইব্রেরী পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে। এই লাইব্রেরি ঘরের লোকদের ইলম চর্চার পরিবেশ তৈরী করবে ।লাইব্রেরি মানে এই নয়যে তাতে প্রচুর কিতাব থাকবে । বরং বিষয়ভিত্তিক কিতাবে দিয়ে লাইব্রেরী সাজাতে হবে। আর এই লাইব্রেরি বাড়ির কমন জায়গায় রাখা যেখানে বাড়ির লোক +মেহমান উভয়েই পড়তে পারবে। বইগুলো অতি যত্নের সাথে রাখা । একটি লাইব্রেরিতে কুরআন, কুরআনের তর্জমা, কুরআনের তাফসীর, হাদিস, আকিদা, ফিকহ, সীরাহ, আখলাক ও তাযকিয়াতুন নফস, ইতিহাস, সাহাবীদের জিবনী এসব বিষয়ভিত্তিক কিতাব অবশ্যই রাখতে হবে। ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন ইসলামীক বই, কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বই, দ্বীনে ফেরা মূলক বিভিন্ন বই ও রাখতে হবে। অন্যকে আল্লাহর দ্বীনে ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক বই পাওয়া যায় সেগুলোও রাখতে হবে। এছাড়া মেহমানদের হাদিয়া দেওয়ার জন্যও আলাদা কিছু কিতাব রাখতে হবে। সেইসাথে পরিবারের সদস্যদের ছোট -বড় সবাইকে টাকা জমিয়ে একটা দুটো করে বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরিতে রাখতে বলতে হবে ।

৪) ঘরে অডিও লাইব্রেরী তৈরী করা : ঘরে দ্বীনী পরিবেশ আনয়নের জন্য অডিও লাইব্রেরী রাখা উত্তম । অডিও লাইব্রেরীর অন্যতম মাধ্যম হলো টেপরেকর্ডার এবং মিনি স্পিকার (ব্লুটুথ স্পিকার) । এর মাধ্যমে ঘরের মানুষদের দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করানো যায় । অডিও লাইব্রেরীতে হকপন্থী উলামায়ে কেরামদের ওয়ায-নাসীহত, বিভিন্ন কারীদের কুরআন তেলাওয়াত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর নাশিদ,কুরআন তেলাওয়াত,সকাল-সন্ধ্যার আজকার এবং ইসলামী শিষ্টাচার রাখতে হবে ।

ঘরে পরিবারে চলতে গেলে দৈনিক বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হয় । সুতরাং সেগুলো জানার জন্য নির্ভরযোগ্য আলেমদের ফতোয়া রেকর্ড রাখতে হবে এবং শুনতে হবে।

এছাড়া এমন লেকচারারদের লেকচার রাখতে হবে যারা উম্মাহর চেতনাকে জাগ্রত করার কাজ করেন, দলিল ভিত্তি কথা বলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন এবং মুসলিম পরিবারে আদর্শ ব্যক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫) মাঝে মাঝে নেককার আলেম ও ত্বলিবুল ইলমদের দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে আসা : ঘরে ঈমানদারদের প্রবেশের মাধ্যমে ঘরে নূর বৃদ্ধি পায় । তাদের কথা শোনা এবং তাদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে অনেক ফায়দা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সৎ সঙ্গীকে আতর বিক্রেতার সাথে উপমা প্রদান, যার কাছে মানুষ উঠাবসা করলে আতরের ঘ্রাণ পায়, যদিও সে আতর ক্রয় না করে। যেমন হাদিসে এসেছে-

আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সৎ সঙ্গীর উপমা হলো আতর বিক্রেতার ন্যায়; যদি তুমি তার কাছ থেকে আতর না-ও ক্রয় করো, তবুও তার কাছে থেকে সুঘ্রাণ পাবে। (মুসনাদ আহমাদ: ৪/৪০৪; সহীহ মুসলিম: ২৬২৮)

সন্তান-সন্তানাদি,বাপ-দাদাদের সরাসরি তাদের সহবতে বয়ান শুনাতে হবে এবং মেয়ে ও মহিলাদের পর্দার আড়াল থেকে বয়ান শুনাতে হবে । ঘরে নেককার লোকদের যাতায়াত থাকলে বদকার লোকেরা এমনিতেই আসা যাওয়া বন্ধ করে দিবে ।

৬) বদদীন লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া: ঈমানদার লোক যেমন ঘরে রহমত ও বরকত নিয়ে আসে বদকার লোক অকল্যান,অশান্তি এবং অভিশাপ নিয়ে আসে। তাই বদকার লোকদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। এরা নিজের পরিবারে যেমন অশান্তির আগুন জ্বালায় তেমনি অন্যের ঘরে গিয়েও অশান্তির আগুন জ্বালায়। এরা কখনো ভালো পরামর্শ দেয়না। এরা সবসময় উষ্কানিমূলক কথা বলে। এসব

লোকের কারণে কত সংসার যে ভেঙ্গে যায়। কতযে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উপর সন্দিহান হয়, কত বাবা-ছেলের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় শুধুমাত্র এই বদদীন লোকদের জন্য। ঘরের মধ্যে জাদু টোনা, চুরি-চামারি, তাবিজ-কবজের মূল কারণ হলো বদদীন লোকদের ঘরে প্রবেশ করা। এ সকল খারাপ লোকদের ঘরে প্রবেশের কারণে ঘর ও পরিবারের লোকদের চরিত্র নষ্ট হয়। হাদিসে এসেছে-

আর মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হলো কামারের মতো; সে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে তোমাকে পুড়িয়ে না-ও দেয়, তবুও তার খারাপ ধোঁয়া তোমার কাছে আসবে।"(মুসনাদ আহমাদ: ৪/৪০৪; সহীহ মুসলিম: ২৬২৮)

সুতরাং এ সকল বদদীন ও দুশ্চরিত্র মানুষদের কখনোই ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন না হোক সে আপনার প্রতিবেশী অথবা বাহ্যিকভাবে আপনার কল্যানকামী কোনো মানুষ।। মানুষ আছে যারা সমস্যা হতে দেখেও চুপ থাকে। দরজার সামনে বদদীন, ফেতনাবাজ লোক দেখেও তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয় ।

ঘরে ফিতনা-ফাসাদ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে মহিলারা। সুনানে তিরমিজিতে বর্ণিত রয়েছে - আমর বিন-আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি বিদায় হজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে উপস্থিত ছিলেন । অথবা তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, আলোচনা ও নসিহত করলেন । এ হাদিসের মধ্যে বর্ণনাকারী একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন..... জেনে রাখ, তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার রয়েছে তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার রয়েছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে অপছন্দ কর তাদেরকে তারা যেন তোমাদের বিছানা ব্যবহারের অনুমতি না দেয় এবং তাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর তাদেরকে তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। জেনে রাখ তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে তোমরা তাদের উত্তম পোশাক পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। (সুনানে তিরমিযী হা/৪৫৮)

সুতরাং কোনো মেয়ের স্বামী বা অন্য কেউ যেসকল নারীদের সাথে আপনাদের চলাফেরা বা বাড়িতে যাতায়েত পছন্দ করেনা তাদের কখনোই বাড়িতে প্রবেশ করাবেননা এবং স্বামীদের ক্ষেত্রেও যদি দেখেন তারা কোনো বদদীন লোকদের ঘরে নিয়ে আসতেছে তাদেরো বুঝানো যেনো তারা বদদীন লোকদের সাথে চলাফেরা না করে । তাদের কাছে ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা ।

৭) ঘর ও পরিবারে শরয়ী বিধানগুলোর শিক্ষা দেওয়া : একটি ইসলামী পরবার গঠনের অন্যতম উপায় হলো ঘর ও পরিবারে শরয়ী বিধানগুলোর শিক্ষা দেওয়া । নিম্নে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো-

ক) পুরুষরা ফরজ নামাজ জামায়াতে আদায় করবে। তবে কোনো শরয়ী ওজরের কারণে বাড়িতে পড়তে পারবে। অন্যান্য নামাজ বাড়িতে আদায় করা উত্তম । (বুখারী হা/১৪৭)

সুন্নাত ও নফল কখনো বাড়িতেও পড়বে কখনো মসজিদে ।

খ) মহিলারা গৃহে নামাজ আদায় করবে। মহিলাদের নামাজের স্থান যত নির্জন ও ঘরের গোপন কামড়ায় হবে তত উত্তম ।(মুসনাদে আহমাদ ৪৪/১৬৪, হা.নং ২৬৫৪২)

গ)অনুমতি ব্যতিত কেউ অন্যের ঘরে নামাজের ইমামতি করবে না এবং গৃহকর্তার নির্দিষ্ট আসনে বসবে না । (মুসলিম হা/৪৬৫)

ঘ) অন্যের ঘরে অনুমতি ব্যতিত না যাওয়া । (সুরা নূর :আয়াত ২৭)

ঙ) খালি ঘরে অনুমতি ব্যতিত প্রবেশ করা জায়েজ আছে। যদি তাতে প্রবেশকারীর কোনো আসবাবপত্র থাকে। (সুরা নূর :আয়াত ২৯)

চ) বন্ধুবান্ধব ও নিকটাত্মীয় যদি কিছু মনে না করে এবং তাদের ঘরের চাবি যদি তার কাছে থাকে,তাহলে অনুমতি ব্যতীত তাদের ঘর থেকে খাওয়া-দাওয়া জায়েজ আছে। (সুরা নূর : আয়াত ৬১)

ছ) পিতা-মাতার ঘরে সন্তানদের জন্য এবং মনিবের ঘরে খাদেম বা দাস-দাসীর জন্য নির্দিষ্ট ঘুমের সময় যেমন ইশার পর, ফজরের আগে, দুপুরে বিশ্রামের সময়; এছাড়াও যদি নির্দিষ্ট কোন ঘুমের সময় থাকে, সে সময় ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ। কারণ এতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দৃষ্টিকটু কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। এ সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে অনুমতি ব্যতীত তাদের প্রবেশ জায়েজ আছে। কারণ সেখানে তাদের বারবার প্রবেশ করতে হয়। আর প্রত্যেকবারে নতুন করে অনুমতি নেওয়া কঠিন। আর এই সময়ে যদি তাদের কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে তো আর ক্ষমা করা হবে।
(সুরা নূর : আয়াত ৫৮)

জ) অনুমতি ব্যতিত কারো ঘরের ভেতরে উঁকি দেওয়া হারাম। (মুসনাদের আহমাদ : ১৪/৫৪৫, হা.নং ৮৯৯৭)

ঝ) রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের সময়ে তার ঘর থেকে বের হবে না এবং তাকে বের করে দেওয়াও যাবেনা। সাথে তার ভরণপোষণও বহন করতে হবে । (সুরা তালাক :আয়াত ০১)

ঞ) অবাধ্য স্ত্রীকে ঘরের ভেতরের শয্যা ত্যাগ ও ঘরের বাইরে পরিত্যাগ করে রাখা যাবে ।
ঘরের ভিতরে পরিত্যাগ করার দলিল হলো আল্লাহর বাণী, তাদের শয্যা ত্যাগ কর । (সুরা নিসা :আয়াত ৩৪)
আর ঘরের বাইরে পরিত্যাগ করে রাখার দলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদেরকে ঘরে রেখে তাদের ঘরের বাইরে ওপরের কামরায় একাকি অবস্থা করেন । (বুখারী ত/২৭, হা.নং ১৯১১)

ট) একাকি বাড়িতে না ঘুমানো এবং একাকি সফর না করা । (মুসনাদে আহমাদ : ৯/৪৬৬, হা.নং ৫৬৫০)

ঠ) পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রেলিং বিহীন ছাদের উপর রাতে না ঘুমানো। (সুনানে আবুদাউদ : ৪/৩১০,। হা.নং ৫০৪১)

ড) ঘরের বিড়াল যখন কোন পাত্রে মুখ দেবে অথবা পাত্র থেকে কিছু পান করবে তখন পাত্র ও পাত্রে থাকা খাবার অপবিত্র হবে না। (মুসনাদে আহমাদ : ৩৭/৩১৬, হা. নং ২২৬৩৭)।

৮) পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া : একটি আদর্শ পরিবারের এটি অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা (সৎকর্মে) ব্যয় করে।"

পরামর্শ করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এটাও সুন্নাহ এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার হুকুম ।

সুযোগ হলে পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসা এবং পরিবারের ভিতরের ও বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। ফলে এর মাধ্যমে পরিবারের সকল সদস্য একে অপরের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পাবে। নিঃসন্দেহে এটা পরিবারের একজনের সাথে অপরজনের সম্পর্ক মজবুত করে। যদিও আল্লাহ তায়ালা পরিবারের দায়িত্ব পুরুষকে দিয়েছে এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারও তারই । কিন্তু সবার সাথে পরামর্শ করে কাজ করলে অন্যরাও ভবিষ্যতের দায়িত্ব বহন করার শিক্ষা পায় । এতে তারাও অনেক খুশি হয় যে পরিবারে তাদেরো একটা মূল্য আছে । পরিবারে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। যেমন হজ-উমরা বিষয়ে, কোথাও ঘুরতে যাওয়া বিষয়ে, কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়া ইত্যাদি। হজ-উমরার জন্য টাকা জমানো,কোথায় ঘুরতে গেলে ভালো হয় সে বিষয়ে মতামত নেওয়া ইত্যাদি। জনকল্যানমূলক কাজ যেমন রাস্তাঘাট মেরামত, দরিদ্রদের লিস্ট করা খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ইত্যাদি। এছাড়া কারো কোনো

বিষয়ে চাওয়া পাওয়া বা সমস্যা আছে কিনা এগুলো নিয়েও আলোচনা করা এবং কোনো আত্নীয় বিপদে থাকলে তাকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। যুবক ছেলে থাকলে তাকে নিয়ে একান্তে বসা বাবার জরুরি এবং মেয়েকে নিয়ে মা। এই বয়সের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। তারা একে অপরের সাথে এই বালেগ বয়সের পরিবর্তন নিয়ে এবং এই বয়সের শরয়ী মাসআলা -মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করবে। বুঝাবে এই বয়সে আমরাও এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম ইত্যাদি। তাহলে বিষয়টি তারা ইতিবাচক ভাবে নিবে। বাবা-ছেলে এবং মা-মেয়ে এভাবে কথা বললে তারা বিপথে যাবেনা এবং খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশবেনা ইনশাআল্লাহ ।

৯) সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ না করা : এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় যে মা-বাবা সন্তানদের সামনে ঝগড়া করবে,রাগারাগি মারামারি করবে । প্রত্যেক পরিবারে কিছুনা কিছু নিয়ে মনোমালিন্য হয়। এমন পরিবার খুজে পাওয়া দুষ্কর যে মনোমালিন্য হয়না । তবে একটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে এই বিষয়টি যেনো সন্তানদের সামনে না ঘটে । দুজনের মনোমালিন্য দুজনের মাঝেই থাকবে এখানে সন্তান বা বাহিরের কেউ যেনো না জড়ায় । অন্য কেউ মাঝখানে ঢুকলে এই পরিবারটি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । যখন শালিশের প্রয়োজন হয় সেটা ভিন্ন কথা । যে পরিবারে মা তার সন্তানকে বলে তোমার বাবার সাথে কথা বলবেনা, বাবা বলে তুমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলবেনা সেই পরিবারে সন্তানদের মন-মানসিকতা কেমন হবে ভাবতে পারেন? সন্তানদের মনে ছোট থেকেই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই কখনোই কোনো বাবা-মায়ের উচিত নয় তাদের মাঝের এই মনমালিন্য সন্তানদের সামনে প্রকাশ করা। কখনো মনমালিন্য হয়ে গেলে নিজেরাই মিটমাট করে নেওয়া। মনে কোনো রাগ-অভিযোগ না রাখা । আল্লাহর কাছে দুয়া করা যেনো সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় এবং এই দুয়াও করা যেনো কখনো তাদের মাঝে মনোমালিন্য না হয় ।

১০) পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা রাখা: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সহমর্মিতা খুবই প্রয়োজন ।পরস্পরের প্রতি থাকবে মমত্ববোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ক। একে অপরের অনুভূতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। একে অপরের সুখ -দু:খ ভাগাভাগি করে নিবে, একে

অপরের সমস্যা গুলো সমাধানের চেষ্টা করবে। কখনো কোনো দোষ করলে তা কঠোরভাবে না বলা। মায়া-মহব্বত দিয়ে বুঝানো। এভাবেই দাম্পত্যজীবন মধুর হয়।

১১) সন্তানদের উত্তম তরবিয়তে লালন-পালন করা : দাম্পত্য জীবন শুরু করার কিছুদিন পরে যখন তাদের কোলজুড়ে সোনামনিরা আসে তখন তাদের দায়িত্বের পরিধি যেনো পাহাড় সমান হয়ে যায়। অনেকে সংসার সামলাতে গিয়ে বাচ্চার ঠিকভাবে যত্ন নিতে পারেননা আবার বাচ্চার সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে গেলে সংসারের কাজকর্ম করতে পারেননা। তাই স্বামীকে স্ত্রীর কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। উভয়ে মিলে সন্তানকে সঠিক তরবিয়তে লালন-পালনের চেষ্টা করবে। একটি শিশুর শৈশবকাল,কৈশোরকাল,যৌবনকাল প্রত্যেকটি ধাপ বিষয়ে বাচ্চাদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে। ছোট থেকে শরীয়াসম্মত শিক্ষা দিয়ে তাদের বড় করতে হবে। তবে একটা কথা না বললেই নয় বর্তমান যুগে বাচ্চা মানুষ করা অনেকটাই কঠিন। আধুনিকতার ছোয়ায় যেনো বাচ্চাকে বড় করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স এবং দ্বীনি কিতাবাদি পড়তে হবে। পড়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। সে অনুযায়ী বাচ্চাদের বড় করার চেষ্টা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ সহজ হবে।

১২) সন্তানদের স্নেহ করা : স্বামী স্ত্রী উভয়ের উচিত সন্তানদের আদর স্নেহে বড় করা। সব সময় সন্তানদের ধমক দেওয়া, রাগারাগি করা, শাসনের সুরে কথা বলা উচিত নয়। বরং সন্তানদের স্নেহ করা আবশ্যক। হাদীসে এসেছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, আক্বরা বিন হাবেস রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন করছেন। তখন তিনি বললেন, আমার দশটি ছেলে রয়েছে আমি তাদের কাউকে চুমা দিইনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দয়া করে না তাকে দয়া করা হয় না ।

১৩) ঘরে শিশুদের যত্ন নেওয়া : মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব হল ছোট শিশুদের যত্ন নেওয়া। এই যত্ন নেওয়ার অনেকগুলো দিক রয়েছে। নিম্নে দিকগুলো তুলে ধরা হলো -

ক) প্রথমত শিশুদের কে ছোটবেলা থেকে সুষম খাবার দিতে হবে। তাদের বয়স অনুযায়ী পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হবে ।

খ) তাদের সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নিজেরা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে তাদেরকে ছোটবেলা থেকে শেখাতে হবে।

গ) কুরআনুল কারিম ও ইসলামিক ঘটনাগুলো মুখস্থ করাতে হবে।

ঘ) তাদেরকে বাহিরে রাস্তার ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে না দেওয়া। না হলে তাদেরও রাস্তার ছেলে মেয়েদের মত মুখের ভাষা এবং চরিত্র খারাপ হবে । সর্বোত্তম হলো প্রতিবেশী কোন কোন ভদ্র বাচ্চার সঙ্গে তাকে বাড়ির ভিতরে খেলতে দেওয়া।

ঙ) বাচ্চাদেরকে শিক্ষামূলক খেলনা দিতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ঘরে তারা খেলবে এবং সেখানে বাচ্চারা তাদের খেলনা সাজিয়ে রাখবে। শরীয়ত পরিপন্থী কোন খেলনা তাদের কিনে দেওয়া যাবে না । যেমন বাদ্যযন্ত্র অথবা মূর্তি ও ক্রুশ বিশিষ্ট খেলনা ইত্যাদি ।

চ) শোয়ার সময় ছেলে এবং মেয়েদের বিছানা আলাদা করা। এটাই দ্বীনদার ও দিনের ব্যাপারে উদাসীন অন্যান্য মানুষের ঘরে সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য ।

ছ) তাদের সাথে মজা করা হাসি ঠাট্টা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদের সাথে রসিকতা করতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, তাদেরকে ডাকার সময় কোমল ভাবে ডাকতেন। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট তাকে খাবার বা ফলের প্রথম অংশটা দিতেন । কখনো কখনো কাউকে নিয়ে হাঁটতে যেতেন। নিম্নে বাচ্চাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমলতা ও হাসিঠাট্টা করা সংক্রান্ত দুটি হাদিস পেশ করা হলো ।

আখলাকুন নাবী ওয়া আদাবু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে -

আমি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য জিহ্বা বের করতেন । শিশুটি তার জিহ্বার লাল অংশ দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে তার কাছে ছুটে আসতো । (আখলাকুন নাবী ওয়া আদাবুহু: ১/৪৯১, হা. নং ১৮৪)

আল আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হয়েছে -

ইয়ালা বিন মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, " আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক খাবারে দাওয়াতে যাচ্ছিলাম। তখন পথে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত সবার সামনে গিয়ে তার দিকে দুহাত প্রসারিত করে ধরলেন। তিনি একবার হাত এদিকে ঘুরালেন এবং একবারও ওদিকে । তিনি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন। এরপর তাকে ধরলেন এবং এক হাত তার থুথনিতে ও অপর হাত মাথায় রেখে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। (আল আদাবুল মুফরাদ : হা/ ৩৬৪)।

১৪) ঘুম, খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা : এটি আদর্শ পরিবারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ঘরকে আবাসিক হোটেলের মতো করা যাবে না। যে যখন ইচ্ছা খাবে যে যখন ইচ্ছা ঘরে ফিরবে। এমন ছন্নছাড়া ভাবে ঘরের সদস্যদের চলতে দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ তবে যদি কোন কাজ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে ঠিক করবে কখন ঘুমাতে হবে, কখন খাওয়া দাওয়া করতে হবে, কখন গোসল এবং অন্যান্য কাজ করতে হবে। যদি কেউ নিজ নিজ কর্মস্থল ও পড়াশুনাসহ অন্যান্য কাজের কারণে রুটিন মেন্টেন করতে না পারে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যারা বাড়িতে অবস্থান করবে তাদের ক্ষেত্রে এই রুটিন মান্য করা জরুরী। তবে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যেন সবাই নির্দিষ্ট একটি সময়ে ঘরে ফিরে একসাথে খেতে পারে এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ে ঘুমাতে পারে।

১৫) ঘরের গোপন বিষয়গুলো বাইরে প্রকাশ না করা : স্বামী স্ত্রীকে কেউই নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো বাইরে প্রকাশ করবে না। এটি একটি নিন্দনীয় কাজ। হতে পারে তা ঘরের কোন গোপন কথা বা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার কথা অথবা ঘরের এমন

কোন বিষয় যা বাইরে প্রকাশ করলে গোটা পরিবারের অথবা পরিবারের কোন এক সদস্যের ক্ষতি হতে পারে।

প্রথম বিষয়টি হারাম হওয়ার দলিল-

হাদিসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট ওই লোকের অবস্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যে তার স্ত্রীর নিকট যায় আর তার স্ত্রী তার কাছে আসে (অর্থাৎ উভয়ের মাঝে মিলন হয়) অতঃপর সে তার গোপন বিষয়ে প্রকাশ করে দেয় । (সহীহ মুসলিম হা/ ১৪৩৭)।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন -

" অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করেছে"। (সুরা নিসা :আয়াত ২১)

এটি হারাম হওয়ার আরেকটি দলিল হল আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদিস । মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে -

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে ছিলেন। তাঁর চারপাশে পুরুষ ও নারী সাহাবীগণও বসা ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "সম্ভবত কোন পুরুষ এমন আছে যে তার স্ত্রীর সাথে যা করে তা বলে বেড়ায়? আর কোন মহিলা এমন আছে যেটা স্বামী সেটা যা হয় তা বলে বেড়ায়? "তখন সকলেই চুপ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ! মহিলারা এমনটি বলে এবং তারাও (পুরুষরা) এমনটি করে। তিনি বলেন তোমরা এমনটি করোনা কারণ এ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওই পুরুষ শয়তানের মতো, যে রাস্তায় নারী শয়তানের সাথে দেখা হলে সেখানেই তারা অপকর্ম করে আর মানুষ তো দেখতে থাকে । (মুসনাদে আহমাদ হা/ ২৭৫৮৩)।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্বের বিষয়টা ঘরের বাইরে নিয়ে আসা। আর এ কারণে অনেক সময় সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। পারিবারিক ছোটখাটো সমস্যার মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে টেনে এনে বেশিরভাগ সময়ই সমস্যাকে আরো গুরুতর করা হয়। যথাসম্ভব নিজেরাই মিমাংসা করার চেষ্টা করা। তা না হলে নিকটাত্মীয়দের সাহায্য নেওয় । যেমনটি সুরা নিসার ৩৫ নং আয়াতে বর্নিত রয়েছে ।

আর তৃতীয় বিষয়টি হলো ঘরের খবর বাইরে প্রচার করা। যে কারণে পরিবার অথবা পরিবারের কোনো সদস্যের ক্ষতি হয় এটা জায়েজ নেই। হাদিসে এসেছে,
ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, " কেউ কারো ক্ষতি করবেনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও হবেনা । (মুসনাদে আহমাদ হা/২৮৬৫)

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ
কাফেরদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা ছিল আমার দুই জন নেককার বান্দার অধীনে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা (নূহ ও লূত আ:) তাদের (স্ত্রী ও স্ত্রী) আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হলো, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।'(সুরা তাহরীম আয়াত ১০)

সুলাইমান ইবনে কাত্তাহ (রহ.) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে فَخَانَتَاهُمَا এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তারা জিনা করেনি। নুহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীর খেয়ানত ছিল, সে মানুষের কাছে বলে বেড়াতো যে, নূহ আলাইহিস সালাম পাগল হয়ে গেছে। আর লুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীর খেয়ানত ছিল, তার মেহমানদের কথা তার গোত্রের লোকদের বলে দিত ।

১৬) নিন্দিত স্বভাব প্রতিহত করা : নিন্দিত স্বভাবগুলো হল মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখুরি করা, হিংসা করা, ঝগড়াঝাটি করা ইত্যাদি । এগুলোর মাধ্যমে সংসারে এবং সংসারের বাইরে উভয় জায়গাতেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। স্বামী স্ত্রীর উচিত নিজেরা এসব থেকে বিরত থাকা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও বিরত রাখা । তাহলে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে এবং বাইরে ও তারা মিলেমিশে চলতে পারবে।

১৭) সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা : স্বামীর উচিত সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস স্ত্রীকে সংগ্রহ করে দেওয়া এবং স্ত্রীর উচিত অপব্যয় না করে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কেনার চেষ্টা করা। স্বামীর সামর্থের বাইরে না যাওয়া। নাহলে স্বামীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে হবে। আবার অনেক স্বামী আছেন সামর্থ থাকার পরেও

স্ত্রীদের সাংসারিক জিনিস কিনে দেননা। এমনটাও করা যাবেনা । প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে সর্বোত্রই এখন প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। এখন রান্নার সব আধুনিক জিনিসপত্র পাওয়া যায়। স্বামীর সামর্থ্য থাকলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হলো স্ত্রীর জন্য এসব জিনিসপত্র কিনে দেওয়া। যাদের স্ত্রীর কষ্ট লাঘব হয়।

১৮)পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা : পরিবারের সকল সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা স্বামী স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি সূরা ফালাক ও নাস পড়ে তাকে ফুঁক দিতেনন।(ছহীহুল জামে হা/ ৪৬৭৫)

তিনি আরো বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে লোকদের জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য বানানোর নির্দেশ দিতেন। তা প্রস্তুত হলে তিনি পরিবার লোকদের নির্দেশ দিতেন এটা হতে রোগীকে পান করাতে। তিনি বলতেন, এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মানে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে। যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দ্বারা তার মুখ মন্ডলের ময়লা পরিষ্কার করে থাকে। (তিরমিযী হা/২০৩৯)।

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষতিকর মুহূর্ত ও অনিষ্টকর জিনিস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন,
যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পারো আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো (বিসমিল্লাহ বলো)। তোমার ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ বলো। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং বিসমিল্লাহ বলো। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখো এবং বিসমিল্লাহ বলো। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও। (বুখারী হা/৩২৮০)

এ হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষার জন্য সর্বদা তাদের সতর্ক করতেন ।

১৯) ঘরে কোমলতার চরিত্র ছড়িয়ে দেওয়া : পারিবারিক জীবনে শান্তি, মানসিক প্রশান্তি এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ঘরে কোমলতা ও নম্রতা ছড়িয়ে দেওয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য অপরিহার্য। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং একটি সুন্দর ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে । সন্তানরা মা-বাবাকে দেখে কোমলতা শিখবে। মা-বাবা যদি কোমল স্বভাবের না হোন তাহলে বাচ্চারা কোমল হবে এটা আশা করা যাবেনা। বরং নিজেদের মাঝে সকল নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে। স্বামী স্ত্রীর এবং সন্তান-সন্ততিদের মাঝে কোমল আচরণ অনেক কল্যাণ নিয়ে আসে। কোমল আচরণের মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব কঠোরতার মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। নিম্নে কোমলতা বিষয়ে কিছু হাদিস বর্ণনা করা হলো -

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে -
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " যখন আল্লাহ তাআলা কোন পরিবারের জন্য কল্যাণ চান, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা দিয়ে দেন । "

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে -
জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা যখন কোন পরিবারকে ভালোবাসেন, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা দিয়ে দেন । "

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে -
আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, " নিশ্চয় আল্লাহ কোমল। আর তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে যে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে তা দেন না ।"

সন্তান প্রতিপালন

বর্ষ: ১৭,

সন্তান প্রতিপালন কি?

সন্তান প্রতিপালন হলো শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় এবং শিক্ষাগত বিকাশে সহায়তা করার সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এটি কেবল অন্ন, বস্ত্র বা আশ্রয়ের জোগান নয়, বরং সঠিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার একটি গুরুদায়িত্ব । অর্থাৎ এটি কোন সংক্ষিপ্ত যাত্রা নয় এটি হলো দীর্ঘ সময়ের একটি যাত্রা ।

সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব :

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? **(সূরা নাহল (১৬) : ৭২)**

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ন। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছে,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। **(সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০)**

সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত :

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত । আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেন। বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْم.ۧ

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। Ñসূরা আনফাল (৮) : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন,

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। Ñতাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনÑ

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِه.ِ

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে

রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। **(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮)**

আরেক হাদিসে এসেছে,
আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। **(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০)**

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য। যদি সন্তানকে আমানত না মনে করে তাকে উত্তম তরবিয়ত না দেই তাহলে জেনে রাখুন মহান আল্লাহ পরকালে ঠিকই পাকড়াও করবেন এবং সন্তানো আমাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দ্বার করাবে ।

সন্তান প্রতিপালনের ফজিলত :

সন্তান আল্লাহর দান। পুত্র ও কন্যা সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার হিকমত ও কল্যাণ-জ্ঞানের অন্তর্গত। আল্লাহ তাআলা কাউকে কন্যাসন্তান দান করেন, আবার কাউকে পুত্রসন্তান; কাউকে আবার কোনো সন্তানই দান করেন না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা–ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন অথবা তাদের উভয়কেই দান করেন—পুত্র ও কন্যা। আর যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।’ (সুরা-৪২ শুরা, আয়াত: ৪৯-৫০)

কন্যাসন্তান মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নিয়ামত। কন্যাসন্তান সৌভাগ্যের নিদর্শন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যার গৃহে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, অতঃপর সে তাকে কষ্ট দেয়নি, তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়নি এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর

প্রাধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।' (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২৩)

নবীজি (সা.) বলেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবতী, যাঁর প্রথম সন্তান মেয়ে হয়।' কেননা কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেছেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।' **(কানজুল উম্মাল, খণ্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ৬১১)**

কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণে অসন্তুষ্ট হওয়া জাহেলি যুগের কাফির-মুশরিকদের মনোভাব। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে প্রচণ্ড দুঃখভারাক্রান্ত হয়। সে এই সুসংবাদ পাওয়ার লজ্জায় লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায় এবং চিন্তা করে—হীনতা সত্ত্বেও কি সে সন্তানকে রেখে দেবে, নাকি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? সতর্ক হও! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা কতই না নিকৃষ্ট!' **সুরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)**
প্রিয় নবীজি (স.) কন্যাসন্তানের প্রতি সম্মান, স্নেহ ও মহব্বতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান বা তিনজন বোন আছে এবং সে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছে, তাদের কারণে নিজেকে অসম্মানিত মনে করেনি, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' **(তিরমিজি: ১৯১২)**

আরও বর্ণিত হয়েছে, 'কারও যদি তিনটি মেয়ে কিংবা বোন থাকে অথবা দুটি মেয়ে বা বোন থাকে, আর সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে ও সদাচার করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসনাদে আহমাদ: ১১৪০৪; আদাবুল মুফরাদ, বুখারি: ৭৯) নবীজি (সা.) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুজন কন্যাসন্তানকে লালন-পালন করেছে এবং বিয়ের সময় হলে তাদের সুপাত্রে বিয়ে দিয়েছে, সে এবং আমি জান্নাতে এভাবে একসঙ্গে থাকব।' এরপর তিনি নিজের দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন। (তিরমিজি: ১৯১৪; মুসলিম: ২৬৩১; মুসনাদে আহমাদ: ১২০৮৯)

নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যার তিনটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধারণ করে, তাদের ওপর ব্যয় করে, তাদের বিয়ে দেয় অথবা মৃত্যু পর্যন্ত

দেখাশোনা করে, তাহলে সেই কন্যাসন্তানেরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে; সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! যদি দুজন হয়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'দুজন হলেও।' লোকটি আবার প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! যদি একজন হয়?' তিনি বললেন, 'একজন হলেও।' **(বায়হাকি, শু'আবুল ইমান: ৮৩১১ ও ৮৩১৩)**

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়ালস্বরূপ হবে।' **(তিরমিজি: ১৯১৩)**
আরও বর্ণিত হয়েছে, 'যাকে কন্যাসন্তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়, আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে।' **(মুসলিম: ৬৮৬২; মুসনাদে আহমাদ: ২৪৬১৬)**

সন্তান জন্মের পূর্বে মা-বাবার করণীয় :

সন্তান জন্মের পূর্বে মা বাবার করণীয় এই কথাটি শুনলে অনেকে অবাক হতে পারে । তারা ভাবতে পারে সন্তান জন্মের পূর্বে আবার কিসের করনীয় ? আমাদের সকল কিছুর একটা পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। তেমনি সন্তান জন্মের পূর্বেও কিছু প্রস্তুতি থাকা দরকার । কেননা আমাদের যে কোন কাজ শুধু দুনিয়ার জন্য নয় আখেরাতের জন্য। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত। আমাদের সন্তান যেন আমাদের ফেতনার কারণ না হয়, সন্তানকে জন্মের পর সঠিক তরবিয়েতে মানুষ করে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং সন্তানকে আখেরাতমুখী করতে পারি তার জন্য আমাদেরকে সন্তান জন্মের পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ মা বাবা ই এ বিষয়টি সম্পর্কে জানে না । তাই দিনকে দিন আমরা অসুস্থ প্রজন্ম লক্ষ্য করছি । না এরা আল্লাহকে চেনে না এরা নিজেদের মা-বাবাকে চেনে। পশ্চিমা সংস্কৃতি এদের মনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ফলে মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়েও তারা ধর্মত্যাগ করছে অন্য ধর্মের অনুসরণ করছে। নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং আমাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে প্রত্যেক মা-বাবারই সন্তান জন্মের পূর্বের করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা

উচিত এবং সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতে হবে। নিম্নে সন্তান জন্মের পূর্বে মা-বাবার করণীয় গুলো উল্লেখ করা হলো -

১) মা- বাবার মানসিক প্রস্তুতি : যেদিন থেকে একজন মা চিন্তা করছে যে তিনি সন্তান নিবেন সেদিন থেকেই তিনি মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবেন। সেদিন থেকে ই তিনি ধৈর্য ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সামনের দিকে আগাবেন। মানসিক প্রস্তুতির অংশস্বরুপ তিনি মাতৃত্ব বিষয়ে ইলম অর্জন করবেন। এই ইলম সামনের পথটা আরো সহজ করে দিবে ইনশাআল্লাহ। এরপর মাতৃত্বের যাত্রা শুরু হলে তিনি ইবাদাত-বন্দেগী,দুয়া,জিকির,দরুদ,ইস্তিগফার, কুরআন তেলাওয়াত, গর্ভকালিন সময়ে বুযুর্গদের বলে দেওয়া সুরা গুলো বেশি বেশি তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে মানসিকভাবে স্ট্রোং থাকার চেষ্টা করবেন । তিনি এটা মনে করে নিজেকে হ্যাপি রাখবেন এই কষ্টের অসিলায় তার সকল সগিরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে । তার এই কষ্টের মাধ্যমে একটি নতুন প্রাণ দুনিয়াতে আসতেছে। একজন বাবাকেও মায়ের সাথে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাকেও মনে রাখতে হবে তিনি এখন বাবা হতে যাচ্ছেন, তার দায়িত্বের পরিধি আস্তে আস্তে বিশাল হবে, তিনি একটি নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন । তিনি তার পরিবারকে কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন তার জন্য আগে থেকেই তিনি মানসিক ও অন্যান্য প্রস্তুতি নিবেন।

২) অনাগত সন্তানের জন্য দুয়া : প্রত্যেকটি কাজের আগে যেমন নিয়ত যাচাই করতে হয় তেমনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে অনবরত দুয়া করতে হয়। দুয়ার বিকল্প কিছু নেই । সন্তান দুনিয়াতে আসার পর দুয়া করবো এরকম ধারণা করা ভুল। বরং পূর্বে থেকেই দুয়া করতে হবে। আমাদের নবী-রাসূলগণ তাদের অনাগত সন্তানদের জন্য দুয়া করেছিলেন। পূর্ববর্তী বুযুর্গ ব্যক্তিগণের জিবনী পড়লেও হয়তো জানতে পারবো তাদের জন্যও তাদের বাবা-মা দুয়া করেছিলেন। তাই সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই।
তাই আমাদেরো উচিত জন্মের পূর্ব থেকেই দুয়া করা । নিম্নে কুরআনিক দুয়া গুলো তুলে ধরা হলো -

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮

তিনি আরো দুআ করেন হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন এবং বলেন

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। (সূরা মারইয়াম (১৯) : ৬)

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। (সূরা আসসাফ্ফাত : আয়াত: ১০০)

হযরত মারইয়াম (আ)এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেন

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৪০।)

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৭৪)

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা । তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী । আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন ।

৩) স্ত্রী সহবাসের পূর্বে দুয়া পড়া এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া : শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাকে যেমন জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাকে চিরস্থায়ী জাহানামি ঘোষনা দেওয়া হয়েছে সে ও তাই আল্লাহর কাছে ওয়াদা করে এসেছে সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে,,জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সে মানুষকে উপর -নিচ, ডানে-বামে সর্বদিক থেকে পথভ্রষ্ট করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও তাই রাসুল সা. এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তার ছলনা থেকে হেফাজতে থাকবো। আবার ভুল করলে তাওবার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু প্রত্যেকের উচিত ভুল করার আগে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা। শয়তান বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আগে থেকেই ওৎপেতে থাকে তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসুল (সা.) এর মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে থেকেই শয়তানের চক্রান্ত থেকে পানাহ চাওয়ার দুয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে সন্তান জন্মের পূর্বেই সহবাসের পূর্বে সহবাসের দুয়া পড়া উচিত। এই সহবাসের ফলে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের সন্তান দেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সেই সন্তানকে শয়তান থেকে হেফাজত করবেন । নিম্নে দুয়াটি দেওয়া হলো -

بِسْمِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে শুরু করছি, তুমি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখ এবং আমাদের মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে, তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।"

৪) মা-বাবার পড়াশুনা : অনেকেই ভাবতে পারেন সন্তান জন্ম দিতে গেলে আবার কিসের পড়াশোনা করতে হবে। বিষয়টি হাস্যকর মনে হলেও এটি অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। একটি শিশু এসে মা-বাবার জীবনকে ধন্য করে তোলে। দুজন নারী-পুরুষ তাদের দুটি আলাদা পরিচয় পায় । তারা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের পাশাপাশি এখন সন্তানের মা-বাবা। প্রকৃত মা-বাবা তারাই যারা সন্তানকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারে। মা হওয়ার জন্য কেবল জন্মদাত্রী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন নারী যখন প্রেগন্যান্ট হন তখন সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে কোন পড়াশোনা করেন না। না বাবারা এ বিষয়ে কোনো পড়াশোনা করে । কিন্তু বিষয়টি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের দেশের নারীরা প্রেগন্যান্ট মানে প্রচুর খেতে হবে , শুধু সুয়ে বসে থাকতে হবে, প্রচুর ঘুমাতে হবে। এছাড়া তেমন কিছু তাদের মাথায় আসেনা। অন্য ধর্মের মা এবং মুসলিম মায়ের মাঝে পার্থক্য আছে । অন্য ধর্মের মায়েরা সন্তান প্রতিপালন বিষয় বই পড়েন, কোর্স করেন তাদের সন্তানদের দুনিয়াবি সফলতার জন্য। তাদের কাছে দুনিয়াই সব। অপরদিকে একজন মুসলিম মা যার মূল লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাত। তাদের সন্তানদের মানুষ ও করবে এই দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। তাহলে একজন মুসলিম মায়ের এ বিষয়ে পড়াশুনা করা কতটা জরুরি । একজন প্রেগন্যান্ট মা এই জার্নি সুন্দরভাবে অতিবাহিত করার জন্য উপকারী বই পড়বেন, বিভিন্ন ভিডিও এ বিষয়ে দেখতে পারেন, সাথে বাবাও বই পড়বেন তাহলে মায়ের সুবিধা-অসুবিধা তিনি বুঝতে পারবেন এবং মা-বাবা উভয়ে মিলে প্যারেন্টিং বিষয়ে বই পড়বেন কিভাবে একজন সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা যায়, কিভাবে তার সন্তানের অন্তরে সঠিক দ্বীনের আলো প্রবেশ করানো যায়। পড়াশুনা করার পাশাপাশি নিজের মাঝেও উত্তম বিষয়গুলো ধারণ করতে হবে। সন্তানকে আদর্শ মুসলিম বানাবো কিন্তু নিজে আদর্শ মুসলিম হবোনা এমনটি যেনো না হয়। নিজের ঈমান-আকিদা ঠিক করতে হবে, আল্লাহর হকগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে হবে , কুরআন,তাফসীর, সীরাহ ইত্যাদি বিষয়েও জানা থাকতে হবে। শিশুদের উপযোগী

ইসলামী কিতাবগুলো কিনে আগে থেকেই পড়া যায় । তাহলে ইনশাআল্লাহ সন্তানকে উত্তম তরবিয়তে মানুষ করা যাবে ।

৫)সন্তান জন্মের পূর্বে মায়ের আমল-আখলাক : সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই মায়ের সঠিক আমল এবং উত্তম আখলাক জরুরী। এই বিষয়টি সম্পর্কে বেশিরভাগ মুসলিম মহিলা উদাসীন থাকে। তারা এই সময়টাতে নিজের আমল আখলাকের দিকে খেয়াল না করে নানা ধরনের অনৈসলামী কর্মকান্ড করে। সন্তান যে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত এই বিষয়টি তাঁরা ভুলে যায়। তাঁরা শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে থাকে। আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন গান-বাজনা,নাটক-সিনেমা ইত্যাদি সেগুলোতেই ডুবে থাকে । তাঁরা হয়তো জানেওনা যে ১২০ দিন অর্থাৎ ৪ মাস পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা গর্ভের শিশুর রুহ ফুঁকে দেন। ফলে সে ১২০ দিন পরই গর্ভ থেকেই মায়ের প্রতিটি কাজ, আচরণ অনুভব করে। প্রতিটি কথা সে শুনতে পায়। তাই মায়ের আচরণ, মায়ের আখলাক,মায়ের ইবাদাত বাচ্চার উপর প্রভাব ফেলে। সেই সাথে বাবার আমল-আখালাকো উত্তম হওয়া জরুরী। নিম্নে সন্তান জন্মের পূর্বে মা-বাবার আমল আখলাকের বিষয়ে করণীয় গুলো তুলে ধরা হল -

ক) মা-বাবা উভয়ে উত্তম ও ভালো কাজের নিয়ত করবে ।
খ) মা-বাবা উভয়ে হালার উপার্জন করবে ।
গ) মা-বাবা উভয় হালাল খাবার খাবে ।
ঘ) ওয়াক্ত মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। যথাসম্ভব আওয়াল ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে ।
ঙ) সম্ভব হলে নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা। যদি শেষ রাতে ওঠা সম্ভব না হয় তাহলে এশার সালাতের পর বিতরের সালাতের আগে দুই রাকাত তাহাজ্জুদের নিয়তে নামাজ পড়া। সম্ভব হলে আরো বেশি পড়া।
চ) নামাজের পর তাসবিহ গুলো পাঠ করা এবং মাসনুন দোয়াগুলো পড়া ।
ছ) সকাল সন্ধ্যায় মা-বাবার নিয়মিত হেফাজতের আমল গুলো করা । এটি নিজের জীবনে আবশ্যক করে নেওয়া। কোনক্রমে সকালে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই পড়ে নেওয়া ।

জ) দুজনেই নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করা। সাধ্যমত কুরআনের তরজমা, তাফসীর পড়া। সম্ভব হলে ছোট ছোট সূরা গুলো হিফজ করা।

ঝ) চতুর্থ পঞ্চম মাস থেকে সূরা লোকমান সম্ভব হলে নিয়মিত পড়া। পুরোটা না পড়লেও কমপক্ষে যতটুকু আয়াতে লোকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন ততটুকু পড়া। এবং আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে বলা তিনি যেন তার সন্তানকে এসব উপদেশ পালন করার তৌফিক দান করেন ।

ঞ) ইসলামী অন্যান্য কিতাবগুলো অধ্যায়ন করা ।

ট) কুরআন তেলাওয়াত অডিও শোনা। যখন পড়তে পারবনা সুযোগ হলে অডিও শুনবো ।

ঠ) মানুষের সাথে সর্বোত্তম ভালো আচরণ করার চেষ্টা করা।

ড) বেশি বেশি ডান সদাকা করার চেষ্টা করা। এবং এই নিয়তে ও সাদাকা করা যেন তাঁর সন্তান সুস্থ স্বাভাবিকভাবে দুনিয়াতে আসে এবং মায়ের যেনো নরমাল ডেলিভারি সহজ হয়।

ঢ) গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, কুৎসা রটনা করা, অহংকার ও দাম্ভিকতা পূর্ণ আচরণ, মিথ্যা বলা এবং সর্বপ্রকার খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ।

ণ) টিভি বা ইন্টারনেটে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, সিনেমা না দেখা ।

ত) মা-বাবা অযথা তর্ক - বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ না করা ।

৬) সন্তান জন্মের আগে মায়ের স্বাস্থ্যগত বিষয় খেয়াল রাখা : একজন সুস্থ মা-ই পারে একজন সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে। তাই নিজে সুস্থ থাকার জন্য এবং গর্ভের সন্তানকে সুস্থ রাখার জন্য এবং দুনিয়ায় তাকে সুস্থ ভাবে আনার জন্য একজন গর্ভবতী মায়ের নিজের স্বাস্থ্যগত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা এবং অন্যদেরও খেয়াল রাখ অতিব জরুরী। নিম্নে স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো -

ক) যখনই কোন মা বাবা ভাবছেন যে তারা সন্তান নিবেন তখনই তাদের একজন গাইনি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ নেওয়া জরুরী এবং ডাক্তারের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলা জরুরী। এবং যখন একজন মা বুঝতে পারবেন যে তিনি গর্ভধারণ করেছেন সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উক্ত ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। আর যদি প্লান ছাড়াই সন্তান গর্ভে এসে যায় তাহলেও যখনই বুঝতে পারবে তখনই ডাক্তারের কাছে যেতে

হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং নিয়মিত চেকআপ করাতে হবে ।

খ) গর্ভবতী মায়ের উপর কোন প্রকার দৈহিক বা মানসিক চাপ সৃষ্টি না করা।

গ) পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকা।

ঘ) সবার সাথে হাসিখুশি ভাবে থাকা এবং হাসি খুশি ভাবে কথা বলা।

ঙ) পূর্বে বাচ্চা থাকলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ না করা, তাদেরকে মারধর না করা । এতে শরীরের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে।

চ) নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত গোসল করা । গোসল করা না গেলে গা পানি দিয়ে মুছে ফেলা ।

ছ) সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা ।

জ) এই সময় ঢিলে ঢালা পোশাক পরা ।

ঝ) পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং পরিমাণ মতো পানি পান করা ।

ঞ) কাঁচা শাকসবজি, মাছ - মাংস না খাওয়া । কেননা এসময় অদ্ভুত কিছু চাহিদা আসতে পারে। তাই কাঁচা মাছ - মাংস, শাকসবজির চাহিদা আসলে না খাওয়া ।

ট) পরিমাণ মতো ঘুমাতে হবে এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে । দিনে আধা ঘন্টার বেশি টানা শুয়ে থাকা ঠিক না । রাতে সঠিক সময় ঘুমাতে যাওয়া । বেশি রাত না জাগা ।

ঠ) ডাক্তারের দেওয়া সাপ্লিমেন্ট গুলো ঠিকমতো খাওয়া।

ড) গর্ভকালীন সময়ের ব্যায়াম গুলো নিয়মিত করা এবং ভারী কাজ না করা।

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের করণীয় :

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বে তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম । তারপর করণীয় গুলো নিম্নে দেওয়া হল -

১) দুয়া করা : শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং বদ নজর থেকে বেঁচে থাকার জন্য দোয়া করা । সন্তান জন্মগ্রহণের সময় যিনি কাছে

থাকবেন তিনি সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। মারইয়াম (আ.) এর মাতাও স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় সমর্পণ করেছিলেন জন্মের আগে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে, এ কারণে সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে । কিন্তু মারিয়াম আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈসা আলাইহিস সাল্লাম এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন । দোয়াটি নিম্নরূপ -

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

নিশ্চয়ই আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম (সূরা আলে ইমরান :৩৬)

২) শুকরিয়া আদায় করা : যেকোনো সুখবর শোনার পর শুকরিয়া আদায় করা উত্তম। তাই সন্তান জন্মের সুসংবাদ শোনার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা । আয়েশা রাঃ নিকট সন্তান জন্মের সংবাদ আসলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন সন্তানটি সুস্থ স্বাভাবিক আছে কিনা। যদি বলা হতো হ্যাঁ তিনি বলতেন, "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন "।

৩) নবজাতকের কানে আযান দেওয়া : অনেকের মনেই ভুল ধারণা সন্তান ছেলে হলে শুধু কানে আজান দিতে হবে মেয়ে হলে দেওয়া যাবে না। অথচ নবজাতক সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ট হওয়ার পরে তার কানে আজান দেয়া সুন্নাত । আজান দিতে হবে ডান কানে । কোন কোন হাদিসে ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনেকে হাদিসটিকে জাল বলেছে অনেকে সহিহ। তবে আজান দিতে হবে বাচ্চার কানে আস্তে আস্তে। কখনোই মসজিদের মুয়াজ্জিনের মত সুর করে জোরে জোরে দেওয়া যাবে না। হাদিসে এসেছে,

আবু রাফি (রা) বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ

"আমি দেখলাম, ফাতেমা (রা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে নামাযের আযানের মত আযান দিলেন।"[1]

৪) তাহনীক করা : নবজাতকের তালুতে খেজুর বা মিষ্টিজাতীয় কিছু ঘষে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে। এটি একটি অত্যন্ত বরকতময় সুন্নাত। হাদিসের আলোকে নবজাতকের তাহনীক সম্পর্কে দেওয়া হলো -
আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা এর খিদমতে (নবজাতক) শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাহনীক করে (খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে) দিতেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) যখন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-কে জন্ম দেন, তখন তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। নবী (সা.) একটি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেন এবং সর্বপ্রথম তাঁর মুখের লালা শিশুর পেটে প্রবেশ করে। এরপর তিনি শিশুটির জন্য বরকতের দোয়া করেন।

৫)দুধপান করানো : সন্তান জন্মের পর মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য প্রথম উপহার হল মায়ের বুকের দুধ। উত্তম হলো এক ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো। সন্তান মায়ের বুকের দুধ পান করবে এটি সন্তানের অধিকার এবং মহান আল্লাহ তাআলার আদেশ। কিন্তু অনেক মা বাচ্চার অধিকার খর্ব করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। তারা বাচ্চাকে দুধ পান করাতে চায়না। প্রত্যেকের একটু চিন্তা করে দেখা উচিত মায়ের বুকে এই দুধ কে দিল? কেন দিল? কেন অন্য সময় না দিয়ে এই সময়ে দিলো ? কোনো সচেতন মা নিজের সন্তানকে বুকের দুধ না খাইয়ে বাহিরের কোনা দুধ কিনে খাওয়াবেনা। এটি অসচেতন মায়ের দ্বারাই সম্ভব।

৬) সন্তানের কল্যানের জন্য পিতা ও অন্যান্যদের দুয়া করা : নবজাতকের জন্মের পর তার জন্য কল্যানের দুয়া করাও সুন্নাত। রাসুল (সা.) এমনটি করতে। তাই প্রত্যেক পিতা এবং অন্যান্যরা যারা থাকবে সকলের উচিত নবজাতকের কল্যাণের জন্য দোয়া কর ।

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের করণীয় :

১) আকিকা করা : সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে আকিকা করা সুন্নত । সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে অথবা সেটিও সম্ভব না হলে ২১ দিনে আকিকা দিতে হবে ।

নবজাতক সন্তান ছেলে হলে ২ টি ছাগল বা ভেড়া এবং মেয়ে হলে ১ টি তার নামানুসারে জবাই করতে হবে । হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

)مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاة(ٌ

যদি কারো সন্তান জন্ম নেয় এবং সে যদি পছন্দ করে আকিকা দিতে,তাহলে সে যেন বরাবর দুটি ছাগল দ্বারা ছেলের আকিকা করে।এবং একটি ছাগল দ্বারা মেয়ের আকিকা করে।(সুনানু আবু-দাউদ-২৮৪২)

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক শিশু তার আক্বীকাহর বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকাহ করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়।
(আবু দাউদ ২৮৩৮)

,
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

আমর ইবন আলী ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল-আ'লা (রহঃ) ... সামুরা ইবন জুনদুব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে।

(ইবনে মাজাহ ৩১৬৫,নাসায়ী ৪২২১)

,

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে

العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري.

ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তান উভয়ের পক্ষ্য থেকে সপ্তম দিনে আকিকা করা হবে এবং যিয়াফত করানো হবে ও চুল মুন্ডানো হবে। এটা মুবাহ তথা সুন্নতে যায়েদা। সুন্নতে মু'আক্কাদা বা ওয়াজিব নয়।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৬২)

অনেকের মনে প্রশ্ন আসে আকিকার গোস্তের বিধান কি?

উত্তর হলো-

আকিকা করার পর এর গোশত স্বাভাবিকভাবে নিজেরাও খাওয়া যাবে এবং আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ফকির-মিসকিনদের মধ্যেও বণ্টন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম রাসুলের (সা.) হাদিসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। যেহেতু এটি সবাইকে নিয়ে উৎসবের মতো একটি বিষয়, আনন্দের বিষয়, সে ক্ষেত্রে একান্ত যেসব আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে গোশত ভাগাভাগি করাই হচ্ছে উত্তম। এ ক্ষেত্রে আকিকার গোশত ভাগ করে লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়াও যাবে।

আরেকটি কাজও করা যেতে পারে। সেটি হলো আকিকার গোশত রান্না করে সবাইকে খাওয়ানোর আয়োজন করা যেতে পারে ।

কুরবানীর গোস্ত যেমন তিন ভাগ করে এক ভাগ, নিজের জন্য রাখা, এক ভাগ গরীবকে দেয়া, একভাগ আত্মীয়দের মাঝে বন্টন করা উত্তম। আবার ইচ্ছে করলে পুরোটাই নিজের জন্য রাখা জায়েজ আছে। তেমনি আকীকার গোস্তেরও একই বিধান।

তিন ভাগ করে নিজের, আত্মীয় ও গরীবদের দেয়া। বা নিজেই পুরোটা রেখে দেয়া। সবই জায়েজ।

আকীকার গোস্ত বন্টন নিয়ে আলাদা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এক সাথেই রাখা যাবে।

2) **উত্তম নাম রাখা** : ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাদের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম থাকা বাঞ্ছনীয় । সুন্দর নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, হাশরের ময়দানে- সেখানে পূর্বাপর সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং ব্যক্তিকে তার নাম ও তার বাবার নামসহ ডাকা হবে।

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُم.ْ
কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের ও তোমাদের বাবার নাম নিয়ে (অর্থাৎ এভাবে ডাকা হবে- অমুকের ছেলে অমুক)। তাই তোমরা নিজেদের জন্য সুন্দর নাম রাখ। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৮
জন্মের ৭ম দিন বাচ্চার নাম রাখা উচিত । বিনা কারনে দেড়ি করা উচিত নয়।

,
হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب. ٌ

আমর ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ করেছেন।

(তিরমিজি ২৮৩২,ইরওয়াহ (৪/৩৯৯-৪০০),)

ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছেঃ

يستحب لمن وُلد له ولد أن يُسمّيه يوم أسبوعه الخ (شامى(

সপ্তম দিনের মাথায় শিশুর নাম রাখা মুস্তাহাব

আগে-পরে হলেও কোনো ক্ষতি নেই। জন্মের আগেও নাম নির্ধারণে বাধা নেই। তবে বিনা কারনে সাত দিন থেকে দেড়ি করা ঠিক নয়।

৩) মাথার চুল কাটা এবং চুলের ওজন সমপরিমাণ রুপা সাদাকা করা : সন্তান জন্মের ৭ম দিনে অভিভাবকের দায়িত্ব হলো, মাথার চুল মুণ্ডন করা।

আলী (রায়িঃ) বলেন:

”عقّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – عن الحسَن بشاةٍ و قال يا فاطمة احلقي رأسه و تصدقي بزنةِ شعره فضّةً “ رواه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة.

“আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসানের পক্ষ হতে ছাগল আক্বীকা করেন এবং ফাতেমা (রাযি:) কে বলেন: তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন বরাবর রৌপ্য সদকা করে দাও”।[তিরমিযী, অধ্যায়, আযাহী, হাদীস নং ১৫১৯]

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তান আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু জবাই করবে, নাম রাখবে ও মাথা মুণ্ডন করে দিবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫২২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা.-এর আকীকা দিয়ে ফাতেমা রা.-কে বললেন, তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫১৯)

অপর এক হাদীসে রূপা বা স্বর্ণ সদকা করার কথাও এসেছে। (আলমুজামুল আওসাত, হাদীস ৫৫৮; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ৬২০৪; ইলাউস সুনান ১৭/১১৯)

সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ফজিলত পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও আমানত। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন,

وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রম্নতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪)

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়। শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, ‘শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।’ সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

তাই সন্তানযে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত এই ভেবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং সন্তান যে আমানত এই আমানতের খেয়ানত যেনো না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সন্তানকে আমানত ভেবে তার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে যেভাবে আল্লাহর রাসুল(স.) শিখিয়ে দিয়েছেন। তাকে ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী বানানো আমাদের মূল দায়িত্ব না আমাদের মূল দায়িত্ব তাকে আদর্শ মুসলিম বানানো। যদি না বানাতে পারি তাহলে আল্লাহর দরবারে ঠিকই জবাবদিহি করতে হবে। সন্তান প্রতিপালনের মূল ভিত্তি তিনটি দেহ,আত্না এবং মন। সন্তানের আত্না,দেহ ও মনে ভারসাম্য রক্ষা করে সুস্থভাবে গড়ে তোলা এটি সন্তান প্রতিপালনের মূল কথা। তাই এই তিনদিকে ব্যালেন্স করে আমাদের সন্তান প্রতিপালন করতে হবে। তিনটা দিকেরই সঠিক পরিচর্যা দরকার। তিনটি দিকের ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া গেলে একটি সন্তান হবে আদর্শ মুসলিম, আদর্শ মানুষ।

সন্তানের আত্নীক সুস্থতার জন্য দরকার আল্লাহকে সঠিক বিশ্বাস, নৈতিকতা ও আল্লাহমুখী চেতনায় পরিশুদ্ধ রাখা ।
সন্তানের মানসিক সুস্থতার জন্য দরকার সন্তানের মনের কথা শুনা, বুঝা এবং অনুভব করা ।
সন্তানের শারীরিক সুস্থতার জন্য দরকার নিয়মিত ঘুম, পুষ্টিকর খাদ্য, খেলাধুলা ও শারীরিক ব্যায়াম ।

নিম্নে তিনটি মূল ভিত্তিকে সামনে রেখে সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার দায়িত্ব গুলো তুলে ধরা হলো -

১. বিশুদ্ধ আকিদার শিক্ষা : সন্তান প্রতিপালনে মহানবী (সা.)-এর প্রথম নির্দেশনা হলো শৈশব থেকে সন্তানের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আকিদার ভিত্তি স্থাপন করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কিশোর বয়সে মহানবী (সা.) তাকে তাওহিদ ও তাকদিরের শিক্ষা দিয়েছিলেন ।
তিনি বলেছেন: “হে বালক, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শেখাব: মহান আল্লাহর বিধানের হিফাজত করবে, তিনি তোমাকে হিফাজত করবেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখবে, তাঁকে তোমার সামনে পাবে।” (সুনান তিরমিজি, হাদিস: ২৫১৬)

শৈশব থেকে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস সন্তানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে এবং হতাশা থেকে মুক্ত রাখে। প্রত্যেক মা-বাবার উচিত ছোট থেকেই বাচ্চাকে সহিহ আকিদার শিক্ষা দেয়া এবং বড় করা। তার জন্য প্রত্যেক মা-বাবার উচিত আগে নিজের আকিদা যাচাই করা এবং নিজেরা সহিহ আকিদার অনুসারী হওয়া ।

২. নামাজের নির্দেশ: মহানবী (সা.) শৈশব থেকে সন্তানকে ইবাদতে অভ্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে। তিনি বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে নামাজের জন্য (প্রয়োজনে) প্রহার করো।" (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫)

নামাজের প্রতি যত্নশীলতা সন্তানের জীবনে শৃঙ্খলা, আত্মিক প্রশান্তি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

৩. সমতা রক্ষা: সন্তানদের প্রতি আচরণ ও ভালোবাসায় সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেছেন: "মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো। " (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৫৮৭)

স্নেহ, উপহার বা আচরণে পক্ষপাতিত্ব সন্তানদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, যা তাদের মানসিক বিকাশে ক্ষতিকর । তাই প্রত্যেক মা-বাবার উচিত সন্তানদের সমতার দিকে লক্ষ্য রাখা।

৪. দয়া ও কোমলতা: সন্তানের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে চুমু দিতেন এবং বলেছেন: "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৯৯৭)

দয়া ও কোমলতা পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে আশা করা যায় সেই সন্তান বড় হয়ে কখনো মা-বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবেনা, তাদের অবহেলা করবেনা ইনশাআল্লাহ ।

৫. উত্তম চরিত্রের শিক্ষা: মহানবী (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ৮৯৫২)

পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানের মধ্যে আমানতদারি, সততা, বিনয় ও সৎকর্মের মতো গুণাবলি প্রতিষ্ঠা করা। এটি নিজের আচরণ বা উপদেশের মাধ্যমে। সন্তান যখন নিজের মা-বাবার মাঝে এসব গুণ দেখে বড় হয় সেই সন্তান কখনো সহজে অনুত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারেনা। প্রত্যেক মা-বাবার উচিত নিজেরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে এবং সন্তানকেও সুশিক্ষা দিবে ।

৬. কন্যাসন্তানের প্রতি গুরুত্ব: ইসলাম কন্যাসন্তানকে সম্মানের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামতের দিন তিনি ও আমি এমন অবস্থায় আসব।" এই বলে তিনি তাঁর আঙ্গুল একত্র করলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৩১)
কন্যাসন্তানের উত্তম প্রতিপালন জান্নাত লাভের মাধ্যম।

৭. শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ: শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মহানবী (সা.) উৎসাহ প্রদান করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন:
"হে আল্লাহ, তাকে গভীর প্রজ্ঞা ও কোরআনের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন।" (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৬)
উৎসাহ শিশুকে আত্মবিশ্বাসী ও সফল করে তোলে ।

৮.পাপ থেকে সতর্কতা: মহানবী (সা.) প্রজ্ঞা ও কোমলতার সঙ্গে সন্তানদের পাপাচার থেকে সতর্ক করতেন। এক যুবক অনৈতিক কাজের অনুমতি চাইলে তিনি প্রশ্ন করলেন: "তুমি কি নিজের মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?" যুবক বললেন, "না।" তিনি বললেন, "লোকেরাও তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ২২২১১)

এটি সন্তানকে যুক্তি ও কোমলতার মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখার উত্তম দৃষ্টান্ত।

৯. কোরআনের প্রতি ভালোবাসা: মহানবী (সা.) সন্তানের হৃদয়ে কোরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫০২৭)। সন্তানদের ছোট বেলা থেকেই কুরআন প্রেমী বানাতে হবে । যে সন্তান ছোট থেকে কুরআনকে বুকে ধারণ করবে,কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করবে সেই সন্তান কখনো বিপথে যেতে পারেনা।

১০. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া : সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া প্রত্যেক মা-বাবার দায়িত্ব। মা-বাবা যদি ছোট থেকেই সন্তানকে সঠিক উপদেশ দিয়ে বড় না করে তাহলে সেই সন্তানের আদর্শ মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা খুবি কম। ভালো ও সুন্দর উপদেশই সন্তানের উন্নত চরিত্র গঠনের অন্যতম উপায়। লুকমান (আ.) তার সন্তানকে এমন কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে এতোই পছন্দনীয় হয় যে তিনি তা কুরআনে লুকমান (আ.) এর নামে স্বতন্ত্র একটি সুরাই নাজিল করেছেন ।

১১. শিশুকে ঘুম পাড়ানো : অনেক মা-বাবা সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর সময় আজেবাজে কবিতা এবং গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। যা মারাত্নক গুণাহের কাজ এবং ছোট থেকেই এসবের মাধ্যমে বাচ্চার সঠিক তরবিয়ত বাধাগ্রস্ত হয়। শয়তান শিশুকে ছোট থেকেই বিপথে নিয়ে যাওয়ার পায়তারা করার সুযোগ পায়। প্রত্যেক মা-বাবার উচিত ঘুম পাড়ানোর সময় ঘুমের দুয়া একটু জোরে বলা বাচ্চা বুঝুক আর না বুঝুক। একসময় তার শুনতে শুনতে মুখস্ত হয়ে যাবে এবং সেই সাথে কুরআনের যেকোনো সুরা বা ইসলামিক গজল গাইয়ে ঘুম পাড়ানো যায়। আল্লাহর গুণগাণ করার কারণে শিশুর উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হবে ইনশাআল্লাহ ।

১২. ছোট থেকেই শিশুর সাথে কথা বলা : অবুঝ শিশু যদিও সে হাসি-কান্না ছাড়া কিছু বুঝেনা তবুও ছোট থেকেই তার সাথে মা-বাবার ভালো ভালো কথা বলা উচিত।

সে কথা বলতে না পারলেও সবকিছু শুনতে পায়। এভাবে ছোট থেকে শুনতে শুনতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে যখন কথা বলার এবং বুঝার ক্ষমতা দিবেন তখন দেখা যাবে ভালো ভালো কথাগুলো সে শিখে ফেলেছে। তাই শিশুদের সাথে কুরআন হাদিস থেকে ভালো ভালো কথা বলা উচিত।

১৩. শিশুকে গল্প বলা : আমাদের অনেকের হয়তো মনে আছে ছোট বেলায় আমাদের দাদা-দাদি,নানা-নানিরা আমাদের সাথে ভূতের গল্প, রাজা-রানীর গল্প, চাঁদের বুড়ির গল্প করতেন । শুনতে শুনতে একসময় অবচেতন মনে এগুলো ঠিকই গেঁথে গিয়েছিল । কিন্তু আমরা অবশ্যই বাচ্চাদের এসব গল্প বলবোনা । এখন বাচ্চাদের উপযোগী অনেক ইসলামীক বই বের হয়েছে । সেগুলো থেকে নবী-রাসূলদের, সাহাবীদৌ গল্পগুলো পড়ে শুনানো উচিত ।

১৪. শিশুদের শিশু উপযোগী বই কিনে দেয়া : আমাদের সমাজের মা-বাবারা শিশু একটু বড় হলে যে ভুল কাজটি করে তা হলো বাচ্চাদের ভূত-পেতনী এসবের নানান বই কিনে দেয়। যা বাচ্চার মেধা বিকাশে বাধাগ্রস্ত করে। মা-বাবার উচিত শিশুদের ইসলামীক যে বইগুলো বের হয়েছে যেমন-নবী-রাসূলদের জীবনি, সাহাবীদের জীবনে এবং ইসলামিক এবং জেনারেল নলেজভিত্তিক বইগুলো কিনে দেওয়া। বাচ্চাদের সাথে বসে তাদের আঙ্গুল ধরে ধরে পড়ানো উচিত যদিও তারা না বুঝে । একসময় দেখা যাবে বড় হতে হতে তা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ।

১৫. শিশুর সাথে খেলাধুলা করা : মা-বাবাদের উচিত বাচ্চাদের বয়স উপযোগী খেলনা কিনে দেয়া। খেলাধুলা করলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। মা-বাবার উচিত সময় করে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করা । এবং বাচ্চা একটু বড় হলে তার বয়সী ভদ্র বাচ্চাদের বাসায় ডেকে এনে খেলা করা। বাচ্চা বাজারে যে খেলনাই চাবে তাকে সেটা না দেয়া যদি সেটা তার উপযোগী না হয়। এবং বাজারে খেলনার মধ্যে গীটার সহ অনেক কিছু আছে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এমন ধরণের খেলনা কখনোই কিনে না দেয়া । পুতুল যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা। এখন পুতুলের মাধ্যমে বাচ্চাদের সঙ্গে নানা অঘটন ঘটতেছে। বাচ্চা না মানলে চোখ-মুখ ছাড়া দেয়া যায়। তবুও আমি বলবো

এসব না দেওয়া। বাচ্চাদের মেধা বিকাশের জন্য এখন অনেক ধরনের উপযোগী খেলনা বের হয়েছে। বিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিয়ে সেগুলো কিনে দেওয়া ।

১৬. শিশুর প্রশ্নের জবাব দেওয়া : শিশুরা যখন একটু কথা বলা শিখে তখন থেকে তারা মা-বাবাকে নানান ধরনের প্রশ্ন করে। এটা কি ওটা কি । হয়তো তারা একই প্রশ্ন বারবার করে । তাই বাচ্চাদের উপর বিরক্ত না হয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর মিষ্টি ভাবে দেয়া। তাকে ধমক দেয়া যাবেনা। যখন একটু বড় হয়ে ভালো মন্দ বুঝতে শিখে তখন তাদের প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে বলা আমি জেনে নিয়ে তোমাকে জানাবো এবং ওয়াদা রক্ষা করা । বাচ্চারা যেনো প্রশ্ন করে অবহেলিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা ।

১৭. আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া : শিশু যখন একটু বুঝতে শিখে তখন থেকে মহান আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন আমরা কেন এই পৃথিবীতে এসেছি তা বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া। তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে আল্লাহর অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন কাজ করা যাবে না। এমনকি যদি লুকিয়েও কিছু করা হয় তাও আল্লাহ দেখবেন এবং পরের শাস্তি দেবেন । আর আল্লাহর কথা শুনলে তিনি খুশি হবেন এবং যা চাওয়া হবে তাই তিনি দিবেন ।

১৮. কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া : ছোট থেকে বাচ্চাদের কায়দা জাতীয় বইগুলো হাতে দেওয়া। আলিফ, বা এই আরবী হরফগুলো এবং এই হরফগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দের সঙ্গে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া । তাদেরকে বোঝানো যখন তারা একটু বড় হবে তারা এই আমাদের মত এত বড় কোরআন পড়বে। এই কুরআন সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের জন্য নাযিল করেছেন তা তাদেরকে বুঝানো। কেন কোরআন নাযিল করেছেন এবং আমরা কেন কুরআন পড়বো তা বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই শেখানো। ছোট থেকে বাচ্চাদের কোরআনের ছোট ছোট সূরা গুলো হিফজ করানো। অর্থ না মনে থাকলেও তাদের অর্থ গুলোও শুনানো।

১৯. জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলা : শিশুদের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েও কথা বলা যেতে পারে। এটা মনে করা ঠিক না যে তারা এগুলোর কি বুঝবে? বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয় আছে যা শিশুর উপযোগী। বাজারে শিশুতোষ বিজ্ঞান এর বইও পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে এই বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে আল্লাহ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে কোরআন হাদিস দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। তাহলে তাদের মনে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগবে।

২০. ভাগাভাগি করতে শেখানো : অনেক শিশুরা ছোট থেকে নিজেদের জিনিস অন্যদেরকে দিতে চায় না। তারা নিজেদের জিনিস ভাগাভাগি করতে পছন্দ করে না। যে সকল শিশুরা এক সন্তান তারা অনেক সময় নিজেদের জিনিস অন্যকে দিতে চায় না, আবার অনেক ভাই-বোন থাকা সত্ত্বেও অনেকে একে অপরের জন্য শেয়ার করতে চায়না। এটা বাচ্চার ভুল নয় বড় তার মা বাবার ভুল। তারা সন্তানকে ছোট থেকে ভাগাভাগি করতে শেখায় নি। মা-বাবারা গোড়া থেকে এই বিষয়ে সচেতন হলে শিশুর জন্য এই বিষয়টা কোন সমস্যা হবে না। তবে আরেকটা বিষয় আবারো বলতে চাই শিশু গর্ভে থাকা অবস্থাতেই মায়ের এগুলো বিষয়ে সচেতন থাকা চাই। মা যেন শিশু গর্ভে থাকা অবস্থাতেই নিজের জিনিস অন্যের সাথে শেয়ার করতে দেয় তাহলে বাচ্চা গর্ভ থেকেই এটা অনুভব করতে পারবে ইনশাআল্লাহ ।

২১) ভাই বোনদের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখানো : একাধিক ভাই বোন থাকলে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখানো সহজ হয়। যে বড় সে তার ছোট ভাই বা বোনকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করবে। হতে পারে পোশাক পরানো বা খাওয়ানো বা বই পড়তে সাহায্য করা বা লিখতে সাহায্য করা। বিভিন্ন ভাবে একে অপরকে সাহায্য করা যায়। ছোট থেকে মা-বাবার উচিত বড়দের এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া আর ছোটদেরও শেখাতে হবে তারা যেন বড় ভাই বোনকে সম্মান করে।

২২) সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো : বেশিরভাগ বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাওয়ানো কঠিন বলে মনে করেন। এর পরিবর্তে তারা বাচ্চাদের প্যাকেটজাত কেক,বিস্কুট,চকলেট,চিপস ইত্যাদি খাওয়ায়। এগুলো বাচ্চার স্বাস্থের উপর

খারাপ প্রভাব পরে। বাচ্চাদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য, ভিটামিন, খনিজ, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বি সমন্বিত একটি সুষম খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের বয়সের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পুষ্টির চাহিদা থাকে এবং তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের খাবারের পছন্দগুলি পরিবর্তিত হয়। তাদের বিকাশে সহায়তা করার জন্য পুষ্টির সুবিধাগুলি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২৩) বাচ্চাকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা : একটি শিশুকে অবশ্যই প্রথমে তাকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত । যদি একটি শিশু প্রথমে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় পরবর্তীতে সে যদি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যাই হোক না কেন অবশেষে একজন ভালো মানুষ হবে ।

২৪) স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখা : বাচ্চাদেরকে স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখার প্রধান উপায় সন্তানের মা-বাবার ফোনের আসক্তি পরিত্যাগ করা। একজন বাবা অথবা মায়ের কাছে যদি সব সময় বই বা কুরআন থাকে তাহলে বাচ্চার হাতে কুরআন দেখা যাবে।

২৫) সন্তানকে যথেষ্ট সময় দেওয়া : প্রত্যেকটি সন্তানই চায় তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিছুটা সময়। বর্তমানে সন্তানদের থেকে এটাই সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে তারা বাবা মায়ের কাছ থেকে সময় পায়না। বাবার পাশাপাশি মা ও এখন অর্থের পিছনে ছুটছে। তাদের মূল লক্ষ্যই টাকা। তাই নারীরাও আজ তাদের প্রধান কর্তব্য স্বামীর সংসার দেখাশুনা করা ও বাচ্চা প্রতিপালন ছেড়ে চাকরির দিকে ছুটছে। দিনশেষে তাদের ঘরে টাকা আসছে ঠিকই কিন্তু পরিবারে শান্তি বিরাজ করছে না। সব সময় অশান্তি দানা বেঁধে থাকে। মা-বাবা দুজনে কর্মজীবী হওয়ার কারণে বাচ্চারা বড় হয় কাজের লোকের কাছে। যে সন্তান নিজের মায়ের আদরে বড় না হয়ে কাজের লোকের কাছে বড় হয় তার আচার - আচরণ, চাল - চলন কেমন হবে আপনাদের কাছেই প্রশ্ন রইল। তাই বলে আমি কাজের লোকের ছোট করছি না ।

২৬) কোরআন ও সুন্নতি তরিকায় বাচ্চাকে বড় করা : মা-বাবার উচিত নিজেরাও কোরআন ও সুন্নতি তরিকায় চলবে এবং সন্তানদেরকেও কুরআন ও সুন্নতি তরিকায়

বড় করবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল আমরা বাবা মায়েরা অজ্ঞ থেকে সন্তানদেরকে হাফেজ আলেম বানাতে চাই । কিন্তু দিন শেষে আমরা কতটা সফল?

২৭) বাচ্চাদেরকে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহমুখী করা : বাচ্চারা যখনই কোন কিছু চাইবে মা-বাবার উচিত তাকে আল্লাহর কাছে চাইতে শেখানো। বাচ্চাকে শেখাতে হবে বাবা সবকিছু আল্লাহ দেয়, মা-বাবা দেয়না। সকল কিছু তারই কাছে চাইতে হয়। তুমি আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে চাও আল্লাহ তোমাকে দিবে ইনশাআল্লাহ।

২৮) সুন্দর সুন্দর দোয়া শিখানো : প্রত্যেক বাবা-মার উচিত সন্তানদেরকে ছোট থেকেই কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দোয়া গুলো শিখানো। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ এভাবে ছোট থেকে শুরু করা যায়। আস্তে আস্তে ঘুম যাওয়া এবং ঘুম থেকে উঠার দোয়া শিখানো, টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে এবং টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোয়া শিখানো। এভাবে পর্যায়ক্রমে দোয়া শিখাতে হব । পর্যায় ক্রমে সকল কিছুর সুন্নতি তরিকা শেখানো। যখন একটু বড় হবে তাকে হেফাজতের আমলগুলো শেখানো এবং সেগুলো সকাল সন্ধায় পড়ায় অভ্যস্ত করা। যতদিন না নিজে পড়তে পারবে ততদিন বাচ্চাকে সকাল সন্ধ্যায় নিজে পড়ে ফুঁক দেওয়া ।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তানদের উপদেশ :

নিজ সন্তানের প্রতি লুকমান আ. এর উপদেশবাণী :

লুকমান (আ.) হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬)

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এই কথার শিক্ষা দেওয়া : এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ।

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ : يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৩)

২. **ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ:** বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন । সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৬)

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ : নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। (সূরা লুকমান (৩১) ১৭)

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা :

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৮)

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা :

وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৯)

লুকমান হামীক তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম। প্রত্যেক মা-বাবা উচিত সন্তানদের উপরিক্ত উপদেশবাণীগুলো দেওয়া । মা-বাবাদের উচিত নিজেরা সুরা লুকমান এর উপর আমল করবে এবং বাচ্চাদেরো অভ্যস্ত করবে । ইনশাআল্লাহ এই বাচ্চা সহজে পথভ্রষ্ট হবেনা ।

ইবনে আব্বাস(রা.)এর প্রতি রাসুল (সা.) এর উপদেশ :

সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন,

يا غلامُ! ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن!

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

احفظ الله يحفظْك، احفظ الله تجده أمامك.

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯)

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

تعرّف إليه في الرّخاء يعرِفْك في الشدة.

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪)

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯)

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجْتَمَعَت على أن يَنْفَعُوْك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। (প্রাগুক্ত)

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رُفعت الأقلام وجَفّت الصحُف.

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।) (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أَصابك لم يكُنْ ليُخْطِئَك، وأن ما أخْطأَك لم يكن ليُصِيْبَك.

স্বারণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। (মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮)

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرَج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪)

লক্ষ করুন, একেকটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন। নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হল শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।
তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর 'ইয়া গোলাম' বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন। 'এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।' এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবক'টি নসীহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে তা হল শিশুকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের লাভের বিবরণ দেওয়া। যাতে নিজ আগ্রহে সে কাজটি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে এর লাভ বলেছেন যে, এতে করে আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবেন, তোমার সাহায্য করবেন।

তদ্রুপ শিশুকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ কাজের ক্ষতির দিকটাও আলোচনা করা। এতে করে শিশুর মনে মন্দ স্বভাবের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

লুকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলো আবার একটু লক্ষ করুন যে কয়টি কাজ থেকে তিনি সন্তানকে বিরত রাখতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটির সাথে ঐ আচরণের মন্দ দিকেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

শিরক সম্পর্কে বলেছেন নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। অহংকারের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উচুঁ কর্কশ আওয়াজের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর।

সুতরাং আমরা শিশুদের প্রতি শুধু ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেই থেমে যাব না; বরং এর সাথে ভালোর লাভ ও মন্দের ক্ষতির কিছু কিছু দিকও তার সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীক দানকারী।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি :

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হল আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, আব্বু! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামায পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন সত্য কথা বল, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খেদমত কর, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন মিথ্যা বল না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারায হবেন।

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন আমীন।

বইয়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক :

কেনো শিশুকে বইমুখী করবেন?

এক.

জন্মের পর প্রথম ছয় বছর একটি শিশু নিজেকে জানতে ও বুঝতে শেখে। তার ভালো লাগা, খারাপ লাগা ও আচার-আচরণের প্রকৃতি এ সময়েই নির্ধারিত হয়। তাই পড়ার প্রতি তারা আকর্ষণ তৈরীর জন্য মোক্ষম সময় এটা। অনেকে মনে করেন পড়ার দিকে ঝোক থাকা না থাকা বুঝি জন্মগত কোন বিষয়। এজন্য বাচ্চাকে পড়াশোনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রতি অনেক অভিভাবকের মাঝেই কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। আবার অনেকে মনে করেন শিশুকে বুঝি যখন তখন পড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলা সম্ভব এসব ভেবে তারা অবহেলা করেন দেখতে দেখতে শিশুটির কৈশোরে উপনীত হয়। অথচ পড়ার সাথে তার কোন সম্পর্কই গড়ে ওঠে না। একদিন সেই সময়টা পেরিয়ে যায়। তাই শৈশবে পড়ার অভ্যাস করে না তুললে পরবর্তীকালে এটা ভীষণ কঠিন সেদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। শৈশব থেকে তাই শিশুকে বইমুখী করতে হবে।

কিছু কিছু মৌসুমী সবজি জিতের শুরুতে লাগাতে হয় আবার কিছু কিছু কেবল আনতেই চাষ করা যায় তেমনি শিশুর মাঝে সর্বোত্তম গুনগুলো বপন করার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এই আদর্শ সমাজ টিকে খেলায় হারানো উচিত নয়।

দুই.

অল্প বয়সে অধ্যায়নের অভ্যাস প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার বিভিন্ন ধাপে কাজে দেবে। সেরা ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের পড়ার পরিধি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনে সফল হতে হলে অবশ্যই সব ধরনের পড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে। এ ধরনের ছাত্রদের হাতে সব সময় কোন না কোন বই থাকে যার মাঝে সে সুযোগ পেলেই ডুব দেয়। সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান অন্বেষণের

পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তারা আরো গভীর ধারণা লাভ করবে। গবেষণায় উঠে এসেছে শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে থাকতে যেভাবে পড়ে স্কুল জীবনের শেষ অবধি সে একই পন্থা অবলম্বন করে। তাই অভিভাবক হিসেবে সবার আগে বই পড়াকে প্রিয় করে তুলতে হবে শিশুর কাছে। খাওয়া দাওয়া আর খেলাধুলার মতো প্রতিদিন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পড়ার প্রতি অনাগ্রহী শিশুরা ভালো স্কুলে ভর্তি হলেও যে খুব একটা ভালো করতে পারে না তা সবাই বোঝে। কেননা বই তাদের কাছে কোন আকর্ষণীয় বস্তু নয়। যথাসাধ্য কম পড়ে তারা পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। সকল প্রকার খেলাধুলা, বিনোদন তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে। আর পড়া হয়ে যাবে সবচেয়ে কঠিন কাজ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, অধিকাংশ শিশুর অবস্থা আজ এমন।

তিন.

পড়ার প্রতি আগ্রহ একটি শিশুর আত্নীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলে। তাদের কল্পনা শক্তি ও চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পড়ার প্রতি একবার অনুরাগ তৈরি হয়ে গেলে সেটাই শিশুর তৃপ্তি ও পূর্ণতার উৎস হয়ে দাঁড়াবে। ১১ বছরের একটি শিশু বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল সাহাবীদের গল্প শুনে। সে গল্পের মাঝে এতটাই ডুবে গিয়েছিল যে খাবারের জন্য ডাকলেও উঠতে চাইতো না। দিনের আলো স্তিমিত হয়ে যেত, তবু বই থেকে দূরে যেতে সে নারাজ। সেই বালকটি আজ মাঝ বয়সে উপনীত হয়েছে এবং বিশ্বের সেরা ১০ জন বিশেষজ্ঞের মধ্যে তিনি একজন। শিশুরা ভীতিকর মজাদার গল্প শুনে শিহরিত হয়। আবার মহান ব্যক্তিদের জীবনী শুনেও উদ্বুদ্ধ হয়। তারা নীতি-নৈতিকতা এবং সাহস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলে ওঠে আমিও এই মানুষটার মত হব। তাই পড়ার মাধ্যমে শিশুরা মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত হয় এবং বড় বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সকল মহান ব্যক্তির শুরুটা ছিল অনন্য কিছু স্বপ্ন লালনের মাধ্যমে আর সে পথেই তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

অভাবের মাঝে বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্য মুক্তির একটি মাধ্যম হতে পারে পড়াশোনা। লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সামনে শিশুর স্বপ্ন ধুলো মলিন হয়ে যায়। কিন্তু পড়া তাকে বদ্ধ জীবন থেকে চিন্তার অসীম ভুবনে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম। কঠিন বাস্তবতা থেকে সে নিজেকে খুঁজে পায় ইতিহাসের পরিব্যাপ্তিতে। তাই পড়া এখানে আসলে জীবনের কোন অংশ নয় বরং এটাই জীবন।

চার.

পড়াশোনা একটি শিশুর সময় ও মনোযোগ দুই-ই ধরে রাখে। ফলে সে টিভি, স্মার্ট ফোন আর ভিডিও গেমস থেকে দূরে থাকে। কিন্তু অনেক পরিবার মনে করে টিভি ও মোবাইল ফোন শিশুদেরকে অপকর্ম ও নিজেদের অনিষ্ঠ করা থেকে বিরত রাখে। তাদের দাবি এসব ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বাচ্চাদেরকে শান্ত ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। টিভি সম্পর্কে এমন ধারণা ঠিক নয়। টিভির মাধ্যমে বিনোদন পাওয়া গেলেও তা শিশুদের মনে মন্দ ধারণা এবং কপট মূল্যবোধ প্রবেশ করাতে পারে।

শিশুকে বইমুখী করে তোলার উপায় :

ক) পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা : শিশুর জীবনে পড়ার সুফল সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি কখনোই তাকে পরার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না। এটিকে শিশুর অভ্যাসে পরিণত করা থেকে তাদের কেউ আটকাতে পারবেনা। অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অর্জনকে সাধারণত সবাই কল্যাণকর মনে করে। প্রতিটি সচেতন অভিভাবক তাই সন্তানকে পড়তে উৎসাহিত করে থাকেন, ভালো ভালো বইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তবে অধিকাংশ মা বাবা শিশুর পড়ার পিছনে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকেন না। এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। বই পড়ার অভ্যাস শিশু গর্ভে থাকতেই করতে হবে। এবং জন্মের পর ছোট থেকেই মা-বাবাকে বই পড়ে শুনাতে হবে। এভাবে সেও একদিন বই পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তবে বড় হলেও যে সে বই পড়ায় মনোযোগ ও অধ্যাবসায়ের সাথে লেগে থাকবে এমনটাও না। তার খেয়াল রাখা এবং পরিচর্যা জরুরি। সেজন্য মা-বাবাকে অনেক পরিশ্রমও করতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ এবং অধ্যাবসায়ের ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। সন্তানদেরকে বই প্রেমী করে তুলতে চাইলে মূলত এটি প্রয়োজন।

খ) দ্রুত শিশুকে পড়তে শেখানো : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে পড়তে শেখানো এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু অনেকেই এই ব্যাপারটি সময়

গড়িয়ে গেলে উপলব্ধি করে। আবার পরিস্থিতির কারনে প্রচেষ্টার পরেও শিশু সময় মত সাড়া নাও দিতে পারে। যাই হোক, শিশুর মাঝে পড়ার আগ্রহ তৈরির সময়টা ফুরিয়ে যায়নি। অনেক শিশু মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দিয়ে অধ্যয়নের মর্ম বুঝতে পারে। এমনকি অনেকে ত্রিশ বা চল্লিশে পা দিয়ে বইপড়ার স্বাদ খুজে পায়। মূল কথা হলো, হাল ছাড়া যাবেনা। কোন জিনিসটা তাকে পড়া থেকে বিরত রাখছে, সেটার প্রতি সূক্ষ নজর রাখতে হবে।

মূলকথা, শিক্ষা এবং দিক-নির্দেশনার সঠিক পন্থাগুলো খুঁজে পেতে আমাদের সতর্ক হতে হবে। পাশাপাশি সফলতা লাভের জন্য দুয়া করতে হবে মন থেকে।

গ) উপযুক্ত সময় নির্ধারণ : শিশুর মাঝে জ্ঞানের সমাহার এবং বুদ্ধি বৃত্তিকভাবে তাকে প্রস্তুত করতে চাইলে তা শুরু করতে হবে খুব অল্প বয়স থেকে। পড়ার প্রতি সুসম্পর্ক স্থাপনাও এই সময়টিতেই করতে হবে। এমনকি গর্ভের শিশুকেও যদি কোনো কিছু পাঠ করে শোনানো যায় তাহলে সে তা থেকে উপকৃত হয় এ কথা বিজ্ঞানীরা বলছে।

পড়াকে প্রিয় করার বন্দোবস্ত শিশুর জন্মের আগে থেকেই শুরু করতে হয় এবং এভাবে পরবর্তীকালেও চলতে থাকে। সবার আগে শিশুকে শুধু পড়ে শোনাতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে গল্পের দৈর্ঘ আর গভীরতা বাড়াতে হবে।

ঘ) স্বতঃস্ফূর্তির সাথে পড়ে শোনানো : বাচ্চা আপনাকে কোনো গল্প পড়ে শোনাতে বললে তার সে চাহিদা পূরণের আগে ব্যাপারটির সাথে অভ্যস্ত হয়ে নিন। পূর্ণ উদ্দিপনা ও প্রস্তুতি রাখুন।
যদি নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করেন তাহলে বাচ্চার কাছ থেকে সময় চেয়ে নিন। হতে পারে তা ৫/৬ ঘণ্টা, তবে অবশ্যই সেটা ভোলা যাবে না।

প্রয়োজনে আপনার স্ত্রী বা শিশুর বড় ভাই বোনদেরও এই দায়িত্ব দিতে পারেন। কেননা ক্লান্ত বা বিরক্ত অবস্থায় পড়তে গেলে তা আকর্ষণীয় হবে না। আর এর কোন মূল্য থাকবে না। এতে করে শিশুর কাছে পড়ার গুরুত্ব কমে যাবে। সে মনে করতে পারে যে সবকিছু তাকেই করে নিতে হবে।

ঙ) ভাষণের মতো করে পড়া না শোনানো : শুধু ছোটরা কেন, ছোট- বড় কেউই ভাষণ শুনতে পছন্দ করে না। বক্তৃতা যার ওপর ঝাড়া হয়, তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এতে করে তারা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে - তাদের মধ্যে কোন সমস্যা আছে দেখে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে। অথবা মনে করতে পারে, বক্তা তাদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর ও আলোচ্য বিষয়ে ভুল-ত্রুটি করা থেকে ঊর্ধ্বে। তাই ভাষণের মতো করে পড়া না শুনিয়ে আনন্দ ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী পন্থায় পড়া শোনানোর অভ্যাস করতে হবে।

চ) টিভি ও ইউটিউব থেকে দূরে রাখা : বাচ্চাদের এসব থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে। বই এবং টিভি-ইউটিউব একসাথে চলতে পারেনা।। তাই বইকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

ছ) উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা : জন্মের পর প্রথম ছয় বছরে শিশুর ব্যক্তিত্বের মৌলিক দিকগুলো গড়ে ওঠে। এ সময়ের সবচেয়ে কাছের মানুষের তারা সে প্রভাবিত হয়। কথা বলার মাধ্যম হিসেবে একমাত্র পরিবারই তার সবচেয়ে কাছে থাকে। কাজেই শিশুর মন ও মননে বইয়ের প্রতি আকর্ষণ ও সখ্যতার গাঁথুনি পরিবারের মতো কেউ তৈরি করতে পারেনা। আবার এই পরিবারই শিশুর খেল তামাশা আর আসার কাজকর্মে সময় নষ্ট করার অভ্যাসের কারণ হতে পারে। তাই পড়ার জন্য বাচ্চাকে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে।

শিশুদের সমস্যা আমাদের করণীয় :

বর্তমানে শিশুদের মাঝে বেশ কিছু সমস্যা জটিল আকার ধারণ করছে। যদি সকল মায়েদের জিজ্ঞাসা করি আপনার বাচ্চাদের সমস্যাগুলো বলেন তাহলে হয়তো কমন কিছু সমস্যার কথাই বেশি বলবে। যেমন - মিথ্যা বলা, পড়াশুনার প্রতি অনীহা, ঝগড়াটে স্বভাব, জেদ, আক্রমনাত্মক আচরণ। নিম্নে এই কমন সমস্যাগুলো কিভাবে দূরীভূত করা যায় বা কন্ট্রোলে আনা যায় তা তুলে ধরা হলো -

শিশুদের মিথ্যা বলা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন :

এক: ৪-৫ বছরের একটা বাচ্চার মিথ্যা বলা নিয়ে বাবা মায়ের আসলে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। এ বয়সি বাচ্চার বাস্তবতা আর কল্পনার মাঝে পার্থক্য করতে পারেনা। তার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথায় যে বাস্তবতার সাথে মিল থাকবে তা কিন্তু জরুরী নয়।

দুই : শিশুকে তার অপরাধ বা ভুল স্বীকার করে নেওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করবেন না। বরং এমন কিছু প্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করুন, যেন সে নিজেরা সাফাই গাইতে না পারে

তিন : বাচ্চারা মাঝে মাঝে নিজেদের এমন গুণের বর্ণনা দিয়ে থাকে যেটা আসলে তাদের মাঝে নেই। সাধারণত বাচ্চারা এ ধরনের মিথ্যা গুলো হীনম্মন্যতা কাটানোর জন্য বলে বেড়ায়। যেমন অনেক বাচ্চা নিজের বাবাকে ধনী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে অথচ তারা খুব ভালো করেই জানে তাদের বাবা মোটেই সম্পদশালী না। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা যেন বাবা মায়ের উচিত সন্তানদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করা যেনো তারা আর কখনো নিজের পিতৃ পরিচয় নিয়ে মিথ্যা না বলে।

চার : পরিবারের সকলে সত্যবাদী হলে বাচ্চারাও দেখে দেখে সহজেই সত্যবাদী হিসেবে বড় হবে। বাচ্চাদের এমন পরিবেশে বড় করে তুলতে হবে যেখানে সত্যকে দেওয়া হয় সর্বাধিক প্রাধান্য এবং সত্যকে অবলম্বন করে সবাই সামনে এগিয়ে যায়। পরিবেশটা এমন হওয়া উচিত, যেখানে শিশুরা মিথ্যাকে একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে। সত্যবাদিতা শেখানোর জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পাঁচ : বাড়িয়ে মিথ্যা বলাও মিথ্যার মতো জঘন্য একটি বাজে অভ্যাস। তাই বাচ্চাদের এ বিষয়ে সতর্ক করতে হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এই অভ্যাসটি ত্যাগ করাতে হবে। সময় লাগতে পারে তবে হাল ছাড়া যাবে না।

ছয় : বাচ্চাদের এই বিষয়টি এভাবে বোঝানো যেতে পারে - সত্য বলা মহৎ একটি গুণ। সত্যবাদী মানুষকে সবাই ভালবাসে। যে মানুষ যত বেশি সত্য বলবে, ততই সে সে পূণ্যের পথে, কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে। একই সাথে বাচ্চাদের এটাও দেখানো যেতে পারে, আমরা মিথ্যা কে কতটা ঘৃণা করি এবং এর ফলাফল কতটা ভয়াবহ। মিথ্যা বলার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে গল্পগুলো পড়ে বাচ্চাদের সেগুলো শুনানো উচিত। একসময় দেখা যাবে বাচ্চারা নিজেরাই বাসায় কেউ মিথ্যা বললে সেটা শুধরিয়ে দিবে।

সাত : খেয়াল রাখতে হবে একটি শিশু যেন কখনোই এমনটা মনে না করে যে, মিথ্যা তাকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। বরং তার মনের ভিতর এই চিন্তার বীজ বুনে দিতে হবে, সত্য বললে তার অপরাধের শাস্তি কমে যাবে। আর মিথ্যা বললে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে। অপরাধের শাস্তীর সাথে তখন নতুন করে যোগ হবে সত্যকে লুকানোর শাস্তি।

আট : শিশুদের মিথ্যা বলার কারণ না জানা পর্যন্ত তাদের এই অভ্যাস থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়ে উঠবে না। শাস্তির ভয় যদি মিথ্যা বলার কারণ হয়ে থাকে, তবে আমাদের উচিত শাস্তির প্রদানের ক্ষেত্রে আরো নমনীয় হওয়া। শিশুটি যেন নিজেকে নিরাপদ মনে করে আবার একই সাথে ঘটনাটি থেকে শিক্ষাও নেয়।

নয়: কখনোই বাচ্চাদের মনে এ বিষয়টি গেঁথে দেওয়া যাবে না যে, সে একজন মিথ্যাবাদী বা বাচ্চার সমস্ত মিথ্যা আমরা ধরে ফেলেছি। মিথ্যা বলা কে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলতে এই বিষয়টি একধরণের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। বরং তাকে সত্যবাদী একজন শিশু হিসেবে মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সত্য কথা বললে তার প্রশংসা করতে হবে আর যদি কখনো সে মিথ্যা বলেই ফেলে তবে এমন ভাব করতে হবে যেন সত্যবাদী শিশুটি আজ নিজের অজান্তে মিথ্যা বলে ফেলেছে। তাকে বোঝাতে হবে সবাই তার কাছ থেকে সত্যবাদিতা আশা করে। এতে ভবিষ্যতে সে আর কখনোই এমনটা করবে না

যেভাবে পড়াশুনার প্রতি অনীহা দূর করাবেন :

এক : পরিবারই শিশুর প্রথম পাঠশালা। শিশুর জ্ঞানার্জন শুরু হয় পরিবার থেকেই। পরিবার যে শুধু ইবাদাতখানা হবে এমনটা যেনো না হয়। পরিবারে একই সাথে ইবাদাত চর্চার পাশাপাশি জ্ঞানার্জন চর্চাও করতে হবে। পরিবারের পর শিশুর ২য় পাঠশালা বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা। বাচ্চাদের এমন প্রতিষ্ঠানে দিতে হবে যেখানে জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ আছে। বাচ্চার ছোট থেকে জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ বাড়লে সে মৃত্যু অবধি এটা ধরে রাখবে ইনশাআল্লাহ।

দুই : জ্ঞানার্জনের জন্য বাচ্চাকে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। সবকিছু তার অনুকূলে রাখতে হবে। ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গার সফলতার জন্য পড়ার যে বিকল্প নেই এটা ছোট থেকেই বুঝাতে হবে। সবকিছু তার জ্ঞানার্জনের অনুকূলে রাখতে হবে। শিশুতোষ ইসলামিক গ্রন্থ গুলোর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি,অংক,বিজ্ঞান সকল ধরনের গ্রন্থ পারিবারিক লাইব্রেরিতে রাখতে হবে। এখানে আবারো একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই অবশ্যই বাসায় পারিবারিক লাইব্রেরি রাখতে হবে।

তিন : বাচ্চা পড়তে না চাইলে সেটার উপযুক্ত কারণ উদ্ঘাটন করা। তা হতে পারে মানসিক বা শারীরিক সমস্যা। বাচ্চাদের সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করা। সঠিকভাবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

চার : বাচ্চাকে এমন প্রতিষ্ঠানে দেয়া যেখানে পাঠদানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। যেখানে পাঠদানের কৌশল আকর্ষণীয়, মজাদার এবং কৌতূহল-উদ্দীপক হয়।

বাচ্চাদের ঝগড়াবিবাদ যেভাবে সামাল দিবেন :

পিঠাপিটি বা বয়সে অল্পদিনের ছোট-বড় ভাই-বোনদের মধ্যে প্রায়শই লেগে থাকে খুনশুটি। যা মাঝে মধ্যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কখনও অতি মধুর সম্পর্ক আবার কখনও অতিব ঝগড়া। এই সম্পর্কের আবহাওয়া বুঝে ওঠাই বড় দায় হয়ে ওঠে।
যদিও মা-বাবার পরেই সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক দাদা-দিদি বা ভাই-বোনের সঙ্গে। কিন্তু কোনও সম্পর্কই সরলরেখায় চলে না। তাই সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে প্রিয় মানুষের

প্রতিও তৈরি হতে পারে ঈর্ষা। মনে মনে এই অনুভূতি তৈরি হলেও, ছোট বয়সে তা নিয়ে সচেতনতা তৈরি হয় না।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে জমতে থাকা নানা প্রশ্ন, কৌতূহল, ক্ষোভের ঢেউয়ে ক্রমশ রং হারাতে থাকে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা। হয়তো নিজেদের অজান্তেই দুই ভাই বা দুই বোন হয়ে ওঠে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই পরিণত বয়সে এই মনোভাব যেন সুস্থ সম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, তার প্রস্তুতি ছোট বয়স থেকেই নেওয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কোন পথে গেলে এই সমস্যা রোধ করা যায় তা নিম্নে দেয়া হলো—

এক : বড় সন্তান যখন তার ভাই অথবা বোনের জন্য কিছু করবে, আপনি তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিন। পরবর্তী ক্ষেত্রে ছোট জনও সেটা মনে রেখে সেটাই করবে।

দুই : ছোট সন্তানের ক্ষেত্রেও বার বার বড় জনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা ঠিক কাজ নয়। বড় জন কিছু করেনি বলে ছোট জন সেই কাজ করতে পারবে না, এমনটা না বলে সার্বিক ভাবে তার কাজের নৈতিক মূল্য বিচার করা সমীচীন।

তিন : দু'জনের মধ্যে কোনও এক জনের প্রতি বেশি নজর দেবেন না। দু'জনের প্রতিই আপনার আচরণ যেন সমান থাকে।

চার : ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া হতেই পারে। সে ক্ষেত্রে তার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বাবা-মাও যদি দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ হয়ে যান, সেটা কাম্য নয়। ছোটখাটো ঝগড়া তাদের নিজেদের মতো করে মিটিয়ে নিতে দিন। বড় সমস্যা হলে দু'পক্ষের কথা মন দিয়ে শুনুন।

জেদি বাচ্চাদের সামলানোর উপায় :

কোমল আচরণ ও ভালোবাসা (রিসালতের আদর্শ):

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় শিশুদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন এবং তাদের ভালোবাসতেন। তিনি বলেছেন, *"যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"* (সহীহ বুখারী)। বকাঝকা বা মারধর না করে সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন।

২ :নেতিবাচক আচরণ এড়িয়ে চলুন:

অতিরিক্ত বকাঝকা বা শারীরিক শাস্তি দেবেন না। এতে তাদের জেদ আরও বাড়তে পারে।

তাদের যেকোনো অন্যায় আবদার সাথে সাথে পূরণ করবেন না। এতে তারা বুঝবে জেদ করলেই কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়া যায়।

৩ : ৭-৭-৭ মডেল অনুসরণ:

হযরত আলী (রা.)-এর একটি চমৎকার নীতি রয়েছে: *"প্রথম ৭ বছর সন্তানের সাথে খেলুন, পরের ৭ বছর শাসন করুন এবং শেষ ৭ বছর বন্ধুর মতো আচরণ করুন।"* বাচ্চার বয়স অনুযায়ী শাসন ও বন্ধুত্বের ভারসাম্য বজায় রাখুন

৪. অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া:

শিশুরা যা দেখে, তা-ই শেখে। আপনি নিজে শান্ত থাকলে এবং রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করলে, সন্তানও সেটি শিখবে।

৫. দোয়ার আমল:

সন্তান অবাধ্য বা অতিরিক্ত জেদি হলে তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা উচিত। কোরআনের একটি বিশেষ আমল অনেকেই করে থাকেন—

সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নম্বর আয়াত:

"আফাগাইরা দ্বীনিল্লাহি ইয়াবগূনা ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি তাওআন ওয়া কারহান ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন।"

(অর্থ: আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারা আল্লাহরই অনুগত এবং তাঁর দিকেই ফিরে।

৬. প্রিয়নবীর ৩টি সোনালী নিয়ম:

শান্ত হোন: বাচ্চার সামনে রেগে যাবেন না বা চিৎকার করবেন না।

কথা শুনুন: সন্তান কেন জেদ করছে তা আগে শুনুন, তারপর যৌক্তিকভাবে বোঝান।

সরাসরি না বলে বিকল্প দিন: কোনো অন্যায় আবদার সরাসরি "না" না বলে, তাকে ভালো কোনো বিকল্প প্রস্তাব দিন।

শিশুদের আক্রমনাত্মক আচরণ দূর করার উপায় :

শান্ত থাকুন: শিশু যখন রেগে গিয়ে আক্রমণাত্মক আচরণ করে (যেমন- মারধর বা চিৎকার করা), তখন আপনি নিজে শান্ত থাকুন এবং ধীরস্থিরভাবে পরিস্থিতি সামলান।

আবেগ প্রকাশ করতে শেখান: শিশুরা অনেক সময় নিজেদের মনের ভাব বা রাগ ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তাদের শেখান, 'তুমি রেগে গেছো, কিন্তু এভাবে আঘাত করা ঠিক না'।

'টাইম-আউট' পদ্ধতি: শিশু যখন বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, তখন তাকে মারধর না করে শান্ত কোনো জায়গায় বা চেয়ারে একা বসিয়ে রাখুন। এর মাধ্যমে সে নিজের আচরণ নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে।

কারণ খোঁজার চেষ্টা করুন: শিশু কিসের জন্য এমন করছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। অনেক সময় ক্লান্তি, ক্ষুধা, ঘুম না হওয়া অথবা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তারা এমন আচরণ করে।

ভালো আচরণের প্রশংসা: শিশু যখন শান্তভাবে কোনো কাজ করবে বা নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করবে, তখন তার প্রশংসা করুন। এতে সে ভালো আচরণের জন্য উৎসাহিত হবে।

সময় দিন: প্রতিদিন শিশুর সাথে মানসম্মত সময় কাটান এবং তার কথা শুনুন। অভিভাবকের ভালোবাসা ও মনোযোগের অভাব হলে অনেক সময় শিশুরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

সন্তান প্রতিপালনে কতিপয় বর্জনীয় :

সন্তান প্রতিপালন অন্যতম গুরুদায়িত্ব। এটি একটি বিদ্যা, যার কিছু মূলনীতি ও কায়দা-কানুন রয়েছে। সন্তান প্রতিপালনে কোন ভুলভ্রান্তি হ'লে তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য মারাত্মক কুফল বয়ে আনে। সেজন্য সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতাকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনেক সময় সতর্কতা সত্ত্বেও সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতা অনেক ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন। এ সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি বর্জন করলে আদর্শ সন্তান গড়ে তোলা অসম্ভব কিছুই নয়। নিম্নে সন্তান লালন-পালনে বর্জনীয় কাজগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

(১) পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে যোগাযোগের অভাব : অনেক পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলার গুরুত্ব বুঝতে চান না। বরং তারা আলাপচারিতাকে মূল্যহীন ভাবেন। ফলে পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ তৈরী হয়। কখনো কখনো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় এবং বয়সকালে এসে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। শিশুর কথার প্রতি যখন গুরুত্ব দেওয়া হয় না তখন সে সহজেই খারাপ সাথীদের সাথে মিশে যায়। সে এমন কাউকে চায়, যে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তাকে ও তার কথাকে মূল্যায়ন করবে এবং তার মনঃকষ্ট দূর করবে। মূলত এমন কাউকে তালাশ করতে গিয়ে সে খারাপ সাথীদের পাল্লায় পড়ে যায়।

তাদের সাথে আলাপ করতে গিয়ে, তাদের মনের কথা জানতে গিয়ে আরো কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন, বয়সভেদে আলাপের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা। বড়দের সাথে আলাপের বিষয় এবং ছোটদের সাথে আলাপের বিষয় এক হবে না। ঠিক তেমনই মেয়ের সাথে যে আলাপ করা হবে তা ছেলের সাথে করা হবে না। অনেক পিতা আছেন যারা ছেলে-মেয়েদের উপর নিজেদের মত জোর করে চাপিয়ে দেন। এটা ঠিক নয়। আমাদের বুঝা দরকার, প্রত্যেক প্রজন্মের পৃথক পৃথক সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনা ও চাহিদা

রয়েছে। ইমাম আলী (রহঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন, ‘তোমাদের সন্তানদের তোমাদের যুগের শিষ্টাচার শেখানোর উপর সীমাবদ্ধ থেকো না। কেননা তারা তোমাদের যুগ থেকে পৃথক যুগের জন্য সৃষ্ট।**(১)**

(২) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে গুরুত্ব না দেওয়া : আল্লাহ তা‘আলা নানা ঝোঁক, খেয়াল ও মেযাজের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির মাঝে এমনই রহস্য নিহিত আছে। তিনি বলেন, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين، ‘বস্তুতঃ যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, তবে সকল মানুষকে একই দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে। কেবল তারা ব্যতীত যাদের উপর তোমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। আর এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তোমার প্রভুর বাণী পূর্ণতা লাভ করবে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব জিন ও ইনসান সবাইকে দিয়ে’ (হূদ ১১/১১৮-১১৯)। এ কারণে ইসলাম বুদ্ধির সক্ষমতা ও অনুধাবনের পারঙ্গমতা বিবেচনা করে মানুষের মাঝে আলোচনা তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যা তাদের রুচি ও মেজাযের অনূকুল হবে। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেছেন, مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة ‘যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করবে, যা তাদের বুঝে আসে না তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে’। **(২)**

ইসলাম তাই বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য স্বীকার করে। এ কথা যেমন পুরো মুসলিম সমাজের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি পুরো পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং পিতা-মাতাকে জানতে হবে যে, তাদের সন্তানরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাদের কেউ হয়তো দ্রুত ডাকে সাড়া দেয়, আবার কেউ ধীরগতির, কেউ আবার চঞ্চলমতির। সুতরাং সকল সন্তান একভাবে কাজ করবে না এবং সবার থেকে এক পদ্ধতিতে কাজ চাইলে পাওয়া যাবে না।

(৩) শিশুর বয়স বিবেচনায় না রাখা : পিতা-মাতাকে সন্তানের বয়সের স্তরের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তারা সকল সন্তানের সাথে এক ধারার আচরণ করতে যাবেন না। শৈশবের দোলনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা সকল ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে

এই একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেকের সাথে তাদের স্তর উপযোগী আচরণ করতে হবে এবং তারা ভুল করলে স্তর মাফিক শাস্তি বা সংশোধনী প্রয়োগ করতে হবে। কখনো তাদেরকে মারার প্রয়োজন হয়। আবার কখনো শুধু গলার আওয়ায একটু উঁচু করলে কিংবা ধমক দিলেই সে সোজা হয়ে যায়। আবার তরুণ-তরুণীরা একটি প্রীতিপূর্ণ কথাতেই পিতা-মাতার বাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং সব বয়সী ছেলে-মেয়েকে একই ধারায় শাসন করা যাবে না।

এজন্য ছোটরা যখন ছালাত আদায়ে অলসতা করে তখন ইসলাম তাদের প্রহার করার অনুমতি দেয়। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে তোমরা ছালাত আদায়ের হুকুম দাও। দশ বছর বয়সে এজন্য প্রহার কর এবং তাদের প্রত্যেকের পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করো। **(৩)**

কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সুতরাং বয়সের তারতম্যের কারণে আচরণেরও তারতম্য হবে।

(৪) অন্যের সাথে তুলনা করা : অনেক পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে এক সন্তানকে অন্য সন্তানের সাথে তুলনা করেন। হ’তে পারে সে তুলনা নিজেরই কোন সন্তানের সাথে অথবা অন্যের সন্তানের সাথে। আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রত্যেক শিশুর স্বকীয় সামর্থ্য, দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যের থেকে আলাদা। তাকে অন্যের সাথে তুলনা করলে অনেক সময় তার মধ্যে হতাশা ও হীনমন্যতা জন্ম নেয়। ফলে শিশু নিজেকে প্রমাণ করতে গিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। এমনকি সব সময় এরূপ তুলনা শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি বয়ে আনে। তার ব্যক্তিত্ব গঠনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সবকিছুতেই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো ছাড়া সে নিজ থেকে ভাল কিছু করতে পারে না।

আসলে শিশুর মানসিকতা বড়দের মানসিকতার মতই। আপনি যখন তাকে তার থেকে অগ্রসর অথবা মেধাবী অথবা শান্ত কোন ভাই কিংবা বোনের সাথে তুলনা করেন তখন সে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়। এ জাতীয় তুলনা শিশুর মধ্যে মানসিক অশান্তি ও গোলযোগ বয়ে আনে এবং তার ব্যক্তিত্ব দুর্বল করে দেয়। সে ভাবে, তার ভাই যা করতে পারছে তা সে করতে পারছে না, অথবা জীবনে আদৌ করতে পারবে না। অথচ দেখা যাবে,

সেও এমন কোন কাজ নিশ্চয়ই করতে পারে যা তার ঐ ভাই করতে পারে না। সে তো আদতে তার ভাইয়ের অনুলিপি বা কার্বন কপি না। সুতরাং এই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

(৫) সন্তানদের মধ্যে সমতা ও ইনছাফ বজায় না রাখা : সন্তানদের মধ্যে সমতা ও ইনছাফ বজায় না রাখার ফলে তাদের মধ্যে হিংসা, শত্রুতা, অবাধ্যতা ও পারস্পরিক ঘৃণা জন্ম নেয়। সেজন্য পিতা-মাতাকে সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ, কথা-বার্তা এবং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সমতা নিশ্চিত করতে হবে। কোন সন্তানকে অধিক স্নেহে সম্পদের অংশ বেশী দেয়া এবং অন্য সন্তানকে বঞ্চিত করার মত বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন ও অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হ'তে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (নাহল ১৬/৯০)।

নুমান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মা রাওয়াহার কন্যা তার পিতার (বাশীরের) নিকট স্বীয় পুত্রের জন্য তার সম্পদ থেকে একটা কিছু উপহার দাবি করেন। কিন্তু দিচ্ছি-দেই করে তিনি এক বছর কাটিয়ে দেন। তারপর তিনি দিতে সম্মত হ'লেন। তখন নুমানের মা বলে বসলেন, তুমি আমার ছেলেকে যা উপহার দেবে তার উপর যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখবে ততক্ষণ আমি তাতে রাজি হব না। (রাবী বলেন,) আমি ছিলাম তখন বালক বয়সী। আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এর মা রাওয়াহার কন্যা চাচ্ছে যে, আমি তার ছেলেকে যে উপহার দেব তাতে আপনি সাক্ষী থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে বাশীর, এছাড়া কি তোমার আরও সন্তান আছে? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের সবাইকে এর মতো উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ 'তবে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা, আমি কোন জোর-যুলুমের কাজে সাক্ষী হই না'। **(৪)**

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ‘তোমার সকল সন্তানকে কি এই সন্তানের মতো দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনছাফ বজায় রাখো। তিনি (নুমান) বলেন, ফলে তিনি ফিরে গেলেন এবং তার প্রদত্ত উপহার ফেরৎ নিলেন। **(৫)**

(৬) সন্তানকে দায়িত্ব না দেয়া :

সন্তানকে কোন কাজের দায়িত্ব না দিয়ে বেকার বসিয়ে রেখে লালন-পালন করা সন্তান প্রতিপালনের একটি মারাত্মক ভুল। দেখা যায়, পিতাই পরিবারের সকল কিছুর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি সকল প্রকার কাজ করে যান। সন্তান বয়স্ক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন দায়িত্ব দিতে চান না। তিনি বুঝতে চান না, এর ফলে সন্তানের ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ছে। তার যে একটা পৌরুষ আছে তা সে বুঝতে পারছে না।

নবী করীম (ছাঃ) সন্তানকে পৌরুষদীপ্ত ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি কিশোরদের সাথে খেলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে একটা প্রয়োজনে পাঠালেন। তাঁর নিকট আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি একটা দেয়াল বা প্রাচীরের ছায়ায় বসে ছিলেন। যে বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা পালন করলাম। আমি যখন আমার মা উম্মে সুলাইমের নিকট আসলাম তিনি বললেন, তোমার দেরি হ’ল কেন? আমি বললাম, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তাঁর একটা দরকারে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, কী সে দরকার? আমি বললাম, এটা গোপনীয়। তিনি বললেন, احْفَظْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাযত করো’। আনাস (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে আমি কাউকে তা বলিনি।**(৬)** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আনাস (রাঃ) ঐ সময়ে বালক ছিলেন। ঐ বয়সেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উক্ত গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন।

(৭) অতিরিক্ত আদর-স্নেহ : সন্তানকে অতিরিক্ত আদর-স্নেহ দেওয়া, চোখের আড়াল হ’তে না দেওয়া। বিশেষত মায়ের পক্ষ থেকে বেশী আদর-আহ্লাদ সন্তানের মানসিকতা

ও আচরণের উপর মারাত্মক খারাপ প্রভাব ফেলে। এর ফলে সন্তানের মধ্যে লাজুকতা, অন্তর্মুখিতা, অধিক ভীতি, আত্মবিশ্বাসে দুর্বলতা, সাথী-সঙ্গীদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা তৈরী হয়। সে হয়ে পড়ে আলালের ঘরের দুলাল।

বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করেছেন যে, অতি আদরে নষ্ট সন্তান অস্থিরমতি হয়। সে সব কাজে তাড়াহুড়ো করে। বিভিন্ন কাজে চিন্তা-ভাবনা না করেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সে কাম্য ও প্রার্থিত কার্যকর পর্যায়ে উঠতে পারে না। অতি আদরে নষ্ট সন্তানের উপর অনেক সময় আমিত্ব বা আত্মঅহমিকা ভর করে। সে নিজেকে তার ভাই-বোনদের থেকে আলাদা মনে করে। তাদের উপর ক্ষমতা খাটাতে পসন্দ করে এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) যখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তার পিতা তাকে ইলমে দ্বীন ও ফিক্বহ অধ্যয়নের মানসে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়েছিলেন। ছালেহ বিন কায়সান তার গৃহশিক্ষক, সার্বক্ষণিক দেখভালকারী, পরামর্শদাতা ও নির্দেশনাদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। একদিন এই শিক্ষক জানতে পারলেন যে, ওমর বিন আবদুল আযীয ছালাতের জামা'আতে যোগ দেননি। তিনি কী ঘটেছে তা জানতে তার নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা সূত্রে বললেন, তোমার জামা'আতে যোগদান না করার কারণ কী? তিনি বললেন, আমি কেশ পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলাম। ছালেহ অবাক বিস্ময়ে বললেন, শুধুই চুল আঁচড়ানোর দরুন তুমি জামা'আতে যোগ দিতে পারলে না! তিনি এ কথা পিতা আব্দুল আযীয বিন মারওয়ানকে লিখে পাঠালেন। পিতা আর কি করবেন! এ কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য তিনি শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ শেখানোর মানসে ছেলের মাথা ন্যাড়া করে দিতে হুকুম দিলেন।**(৭)**

উল্লেখিত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, সে যুগে 'আদব বা শিষ্টাচার' শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিষয় ছিল। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের নিকট পাঠাতেন। তারা তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধান করতেন, হাতে-কলমে আদব শিখাতেন এবং নেতিবাচক কিছু পেলে নিজেদের পদক্ষেপের সাথে অভিভাবকদের সহায়তা নিতেন। দুঃখের বিষয়, আজ শিক্ষার শত শত বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু আদব বা শিষ্টাচার নামে কোন বিষয় আজ আর কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসায় পড়ানো হয় না। তাই সমাজে আদবওয়ালার তুলনায় বেয়াদবের সংখ্যা বেশী। এই পরিস্থিতির গোড়ায় রয়েছে সন্তানদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ।

(৮) মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও নির্দয়তা : অতিরিক্ত স্নেহ-আদর যেমন শিশুর উপর খারাপ ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তেমনিভাবে মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতাও তার উপর একই রকম কুপ্রভাব ও খারাপ পরিণতি ডেকে আনে। অতিরিক্ত নির্মমতা শিশুর অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়, তাকে কাপুরুষ ও ব্যক্তিত্বহীনে পরিণত করে। ফলে সে নিজের হক পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না, কিংবা কোন মযলুমের সাহায্যার্থে তার পাশে দাঁড়াতে পারে না। উল্টো অনেক সময় শিশুর মধ্যে একগুঁয়েমি ও প্রতিশোধপরায়ণতা জন্ম নেয়। মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সমাধান নয় এবং তা সন্তানদের সংশোধনের কোন পন্থাও নয়। সন্তানদের প্রতি নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণের মাত্রা অনেক অভিভাবকের ক্ষেত্রে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, হিংস্র প্রাণীদেরও তাদের তুলনায় বেশী দয়ালু হ'তে দেখা যায়।

মাতাপিতাদের জানতে হবে, কঠোরতা ও নির্মমতা ওষুধের মতো, যা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। সংশোধনের নমনীয় নানা উপায়-পদ্ধতি যখন কোন কাজ দেবে না তখন শেষ চিকিৎসা হিসাবে অভিভাবক কঠোরতা আরোপ করতে পারেন।

জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত'।**(৮)**

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে আয়েশা, 'আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতা ভালবাসেন। তিনি কোমলতার ভিত্তিতে যা দেন কঠোরতার ভিত্তিতে তা দেন না। অনেক কিছু আছে যা কোমলতা ছাড়া তিনি দেনই না'।**(৯)**

আরেক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَه 'নিশ্চয়ই কোন জিনিসের মধ্যে কোমলতা থাকলে সে তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর কোমলতা কোন জিনিস থেকে তা তুলে নেওয়া হ'লে তাকে কলুষিত করে'। **(১০)**

শেষকথা : সন্তান দুনিয়াবী জীবনে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত করা প্রতিটি পিতা-মাতার সর্বোচ্চ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। অন্যদিকে তা পালনে ব্যর্থ হ'লে লাঞ্ছনার শিকার হ'তে হবে। এজন্য সন্তানের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা এবং তাদেরকে সৎ,

আদর্শবান ও দ্বীনদার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

১) উসামা বিন মুনকিয, লুবাবুল আদাব, পৃ. ৭০।
২) মুসলিম ১/১১, হা/৫-এর আলোচনা দ্র.।
৩) আহমাদ হা/৬৬৮৯; আবুদাউদ হা/৪৯৫।
৪) বুখারী হা/২৬৫০; মুসলিম হা/১৬২৩।
৫) বুখারী হা/২৫৮৭।
৬) আহমাদ হা/১৩৪৯৪; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৫২১; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৩৯।
৭)সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/১৩৩।
৮)মুসলিম হা/২৫৯২।
৯)মুসলিম হা/২৫৯৩।
১০)মুসলিম হা/২৫৯৪।

পারিবারিক সমস্যাবলীর কারণ এবং সমাধান

সমাজের একক ও ভিত্তি ভূমি হল পরিবার। পরিবার যদি সুন্দর হয় সমাজ সুন্দর হবে অপরদিকে পরিবারে যদি বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজ করে তাহলে সমাজেও বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেবে। তাই প্রত্যেকের উচিত পরিবারের সমস্যা গুলো চিহ্নিত করা এবং এর সমাধানের পথ বের করা। নিম্নে কতিপয় পারিবারিক সমস্যা এবং এর সমাধান দেওয়া হল -

পারিবারিক সমস্যার কারণসমুহ:

১) মৌলিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসন ও সুশিক্ষার অভাব : অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ ধর্মীয় অনুশাসন ও সুশিক্ষার অভাব । যার ভিত্তি বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে। আমাদের পরিবারগুলো কেমন হবে? জীবনধারা, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, একে অপরের হক সম্পর্কে সচেতনতা, বিনয় ও ছাড়ের মানসিকতা এই সবই অনুশাসনের আওতাভুক্ত। এমনিভাবে পর্দা রক্ষা পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে সম্পর্ক ও মেলামেশা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসন পালন না করা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ।
ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এ সমস্যাগুলো থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব ইনশাল্লাহ ।

২) পারিবারিক জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব : পারিবারিক জীবনে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। হাজবেন্ড ওয়াইফের দুটি পাসওয়ার্ড যুক্ত প্রফাইল যেনো দুটি নাইট ক্লাবের মতো। দুজনের দুই স্বাধীন রাজ্য। যেখানে বিবাহিত হয়ে অবিবাহিতের ভান করা যায়। কেউ কারো রাজ্যে প্রবেশ করছে না এরকম ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। ছোট ছোট দু একটা চ্যাটিং এর শেষ পরিণতি হতে পারে বিবাহ বিচ্ছেদের মত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। যে ঘটনা আধুনিক সমাজে এখন খুব সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৩) স্ত্রী সন্তানদের প্রহার করা : কথায় কথায় স্ত্রী-সন্তানদের শাস্তি দেওয়া, প্রহার করা পরিবারে অশান্তির কারণ। স্বামী বা পিতা নিজের নির্দেশ পালন করার জন্য স্ত্রী সন্তানদের জোর তাকিদ দেয়া এবং সময় মতো কাজ সম্পন্ন না হলে শাস্তি দেয়া ও প্রহার করা পারিবারিক অশান্তির কারণ।

৪) অন্যের হক বিনষ্ট করা : স্ত্রী-সন্তান ও অন্যদের হক যথাযথ আদায় না করা তাদের অধিকার হ্রাস করা ও জুলুম করা পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। পরিবারের কর্তা যখন পরিবারের প্রধান হয়ে অন্যদের হক আদায় করেনা তখন সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।

৫) পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও কু ধারনা : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বোঝাপড়ার অভাব ও কুধারণা সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। ইসলাম বিমুখ জিবনযাপনের কারণেই বোঝাপড়ার অভাব বেশি হয়। ফলে দুজন আলাদা থাকা শুরু করে। এমনো হয় যে তারা কেউ কারো সাথে যোগাযোগ ও করেনা। ফলে দুজন দুজনের প্রতি কুধারণাও জন্মে । ফলে তাদের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে।

৬) যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব : স্বামী বা পরিবার প্রধান কর্তৃক স্ত্রী সন্তান ও অন্যান্যদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী স্বভাব অনুপ্রবেশ করে। গর্ব, অহংকার, দাম্ভিকতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি তাদের মানবিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে। তাই তাদের চরিত্র গঠন, ভুল সংশোধন, মানবিক উন্নয়নের জন্য নসিহত ও শাসন উভয়ই বজায় রাখতে হবে।

৭) পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা না দেওয়া : প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব অবস্থা ও মর্যাদা রয়েছে তাই তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য কিন্তু পরিবার প্রধান তাদের মর্যাদা না বুঝলে এবং তাদের মর্যাদা না দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে অপমান, অপদস্ত ও লাঞ্চিত করলে ক্ষোভের আগুন ধুমায়িত হয়। ফলে পরিবারের অশান্তি নেমে আসে। সুখের সংসার হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ।

৮) অল্পে তুষ্ট না থাকা : মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকে না । লোভা তার সীমাহীন। যে যত পায় সে তত চায়। আমাদের শুধু চাই চাই। গাড়ি চাই বাড়ি চাই টাকা চাই ইত্যাদি। একটা পেলে আরেকটা চাহিদা বেড়ে। মানুষ যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা করে এবং তার বৈধ টাকায় তা সম্ভব না হয় তখন সে অবৈধভাবে ইনকাম করার চেষ্টা করে। এই লোভ স্ত্রীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। সে নিজের স্ত্রীর চেয়েও আরো রুপসী মেয়ে খুঁজে। তার দিকে তাকায়, তাকে কল্পনা করে। এর পরিণাম ভয়ংকর।

৯) পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা : পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা পারিবারিক অশান্তির অন্যতম কর। প্রবাসী স্বামী বছরের পর বছর স্ত্রী থেকে বিছানা থাকে, কেউবা দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের কারণে স্ত্রী থেকে দূরে থাকে। আবার অনেকে সারাদিন কর্মস্থলে থেকে অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে অন্যের সাথে খোশ গল্পে মত্ত হয় , কেউবা স্ত্রী

পরিজনকে সময় না দিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে এ থেকে মনোমালিন্য অশান্তি শুরু হয়।

সমাধান :

পারিবারিক সমস্যা রোধকরণে উপরিউক্ত বিষয়গুলো পরিহার করার পাশাপাশি আরো কিছু করণীয় আছে । নিম্নরুপ-

১)পরিবারে ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২) পরস্পরকে ক্ষমা করা, ছোট-খাট ত্রুটিচ্যুতি উপেক্ষা করা ও সংশোধন করা ।

৩) সদস্যদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া ও তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করা ।

৪) রাগ পরিহার করা ও ধৈর্য ধারণ করা।

৫) সকলের প্রতি সুধারনা পোষণ করা এবং কুধারনা পরিহার করা।

৬) উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করা ও সমাধানের চেষ্টা করা ।

৭) মুখ বা জিহ্বা সংযত রাখা।

৮)। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সমস্যা প্রকাশ না করা এব প্রয়োজনে নিকটতাত্নীয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করা ।

৯) পরিবারে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্টা করা।

১০) আচার-আচরণ ও ভাষা প্রয়োগে নম্র ও মার্জিত হওয়া।

মানুষ হিসেবে ভুল করা স্বাভাবিক । স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ভুল বুঝাবুঝি হবেনা এমনটা না। ভুল হবে তবে একে-অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং নিজেরা সংশোধন চেষ্টা করতে থাকবে। ভুল হলে অপরের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং অপরকে ক্ষমা করে দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে দিনশেষে একই ছাদের নিচে থাকতে হবে। তাই সমস্যাকে বড় না করে দুজনে মিলে প্রয়োজনে পরিবারের বড়দের মাধ্যমে মিমাংসা করে নেওয়া। উত্তম হলো নিজেরাই মিটমাট হওয়া। তাহলে ইনশাআল্লাহ একটি সুখী আদর্শ পরিবার গঠন জরা সম্ভব ।

পারিবারিক শান্তির উপায়

সালাম দেয়া :সালাম দেওয়া জান্নাতি সুন্নাত। যেটা প্রথম আদম আলাইহিস সালামকে শেখানো হয়েছিল । সবাই সবাইকে সালাম দেওয়া উচিত। ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে বড়রা ছোটদেরকে সালাম দিবে। এভাবে সালামের প্রসারণ ঘটাতে হবে । বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়া । যদিও অন্য কেউ ওই ঘরে বসবাস না করে। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বরকতমন্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন। (সুরা নূর : আয়াত ৬১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে রিজিক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে । যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয় সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে ।

২) ঘরে হারাম কাজ বন্ধ করা ও শরীয়ত বিরোধী জিনিস পুতুল মূর্তি না রাখা : ঘরের কোন সদস্য যেন কোন হারাম কাজে লিপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। তারা যেন গান

বাজনা সিনেমা নাটক না দেখে। পরিবারের সদস্যদের হেফাজতের আমলে অভ্যস্ত করা। সেই সাথে খেয়াল রাখতে হবে ঘরে যেন শরীয়ত বিরোধী কোন জিনিস যেমন মূর্তি, পুতুল না থাকে। ঘরে পুতুল বা মূর্তি থাকলে সেখানে রহমতের ফেরেস্তারা আসে না, সেখানে শান্তি ও আসে না। সেই সাথে আরো খেয়াল রাখতে হবে ঘরে যেন কোন মানুষ কিংবা প্রাণীর ছবি টাঙানো না থাকে।

৩) ঘরে মাঝে মাঝে নফল ও সুন্নত নামাজ পড়া : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফরজ ছাড়া সকল প্রকার সুন্নত, নফল ইত্যাদি বাড়িতে পড়া উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ

“বাড়িতে সালাত আদায় করাকে তোমরা নিয়ম বানিয়ে নাও। কেননা পুরুষের জন্য ফরয সালাত ব্যতীত ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম।” [বুখারী হা/৭৩১; মুসলিম হা/৭৮০]

তিনি আরও বলেন:

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا

“তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে যেন ঘরের জন্য সালাতের কিয়দাংশ রেখে দেয়। কেননা ঘরে সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তাতে কল্যাণ দান করেন।” [ইবনে মাজাহ হা/১৩৭৬; সিলসিলা সহীহাহ হা/১৩৯২।]

আব্দুল্লাহ ইবনে সা‘দ রা. হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلاَةُ فِى بَيْتِى أَوِ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ أَلاَ تَرَى إِلَى بَيْتِى مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً.

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম:
কোনটি উত্তম, আমার ঘরে সালাত আদায় করা না কি মসজিদে?

তিনি বললেন: তুমি কি দেখ না আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে ঘরে সালাত আদায় করা আমার নিকটে অধিক প্রিয়; ফরয সালাত ব্যতীত'। [ইবনে মাজাহ হা/১৩৭৮; সহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৯।]

তিনি আরও বলেন,

اجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

"তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না'। [বুখারী হা/৪৩২, ১১৮৭; আবু দাউদ হা/১০৪৩, ১৪৪৮; তিরমিযী হা/৪১৫; ইবনে মাজাহ হা/১১৪১; মিশকাত হা/৭১৪।]

উপরোক্ত হাদিস সমূহ থেকে ফরয সালাত ছাড়া অন্যান্য সাধারণ নফল-সুন্নত ইত্যাদি সালাত বাড়িতে পড়ার গুরুত্ব ও ফযিলত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

,

وفى الشامية(٢/٢٢): (قوله والافضل فى النفل الخ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها، لحديث الصحيحين ''عليكم الصلاة فى بيوتكم فان خير صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة'' واخرج ابو داؤد ''صلاة المرء فى بيته افضل من صلاته فى مسجدى هذا الا المكتوبة'' وتمامه فى شرح المنية وحيث كان هذا افضل يراعى مالم يلزم منه خوف شغل عنها لوذهب لبيته، او كان فى بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه فيصليها حينئذ فى المسجد لان اعتبار الخشوع ارجح

বাড়িতেই সুন্নাত নফল নামাজ আদায় করা উত্তম।

হ্যাঁ যদি বাড়িতে গিয়ে কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,বা খুশু খুজুতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,তাহলে মসজিদেই পড়া উচিত।

(ফাতাওয়ায়ে শামী ২/২২ নাজমুল ফাতওয়া ২/২৬১)

وفى الهندية(١/١١٣): الافضل فى السنن والنوافل المنزل لقوله عليه السلام صلاة الرجل فى المنزل افضل الا المكتوبة الخ.

সারমর্মঃ উত্তম হলো সুন্নাত নফল নামাজের ক্ষেত্রে বাড়িতেই আদায় করা।

৪) ঘরে তালিম করা ও এলাকার তালিমের পয়েন্টে যাওয়া : প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় ঘরের মাহরামদের নিয়ে বসে ৫-১০-১৫ মিনিট বা সবার সুবিধামত সময় তালিম করানো। এমন একটি সময় নির্ধারণ করতে হবে যখন ঘরের সকল মাহরাম পুরুষরা এবং মহিলারা বাড়িতে থাকে। তালিমের জন্য নির্ভরযোগ্য বই হল রিয়াদুস সলিহিন। এছাড়া অন্যান্য কিতাব বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। এলাকায় কিছু কিছু তালিম সপ্তাহে একদিন বসে সেখানেও সম্ভব হলে যাওয়া ।

৫) একসাথে খাবার খাওয়া : ঘরে হাজবেন্ড ওয়াইফ একসাথে খাবার খাওয়া এবং ছোট বাচ্চাদেরও একসাথে নিয়ে খাওয়া। যদি মা-বাবা থাকে তাদেরও একসাথে নিয়ে খাওয়া উত্তম। এতে পারস্পারিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে ইনশাআল্লাহ ।

৬) কোরআন তেলাওয়াত করা : ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা সুন্নত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা রেখে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তাই প্রত্যেকের উচিত নিজ ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা। দিনের শুরুটা যেন হয় কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআনের তাফসীর দিয়ে। শুরুর দিকে ছোট ছোট সূরা গুলো হিফজ করার টার্গেট নেওয়া যায় সকলে মিলে। এক আয়াত করে পড়ার টার্গেট নেওয়া যায়। ছোটদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। এবং বড়রা কুরআনের তাফসীর পড়বে এবং পরিবারের ছোটদের ও মুরুব্বিদের বুঝিয়ে বলবে।

৭) হেফাজতের আমল করা : শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। দ্বীনের কাজ করলে শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পায়। শয়তান বিভিন্নভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করে এবং দ্বীনের পথ থেকে সরিয়ে দেয়। শয়তানের সাথে সাথে বদনজর, হাসাদ সিহরের মত সমস্যাসমুহ হতে হেফাজতের জন্য নিয়মিত আমল চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। প্রত্যহ সূর্যোদয় ও সুর্যাস্তের সময় ফেরেশতাদের নেয় শয়তানের বাহিনিও পালা বদল করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সকালের আমলসমূহ সুর্যদয়ের পূর্বে এবং সন্ধ্যার আমলসমূহ মাগরিবের পূর্বে বা পরে আদায় করা উত্তম। তবে ভুলে গেলে যখনি মনে পড়বে তখনি আদায় করে নিতে হবে।

৮) বেড়াতে যাওয়া : পর্দার সহিত ভালো কোনো জায়গায় স্ত্রীকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া। বা দূরের সফরে গেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া উত্তম । তবে পর্দার সমস্যা হতে পারে এমন জায়গায় স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া অনুচিত ।

দূরে কোথাও সফরে গেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। বিভিন্ন সফরে তিনি স্ত্রীদের কোনো একজনকে সঙ্গে নিতেন। হজ-ওমরাহসহ বিভিন্ন যুদ্ধেও স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন বলে একাধিক হাদিস থেকে জানা যায়।

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন বনি মুস্তালিক মতান্তরে মুরাইসি যুদ্ধে যান, তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে হজরত আয়েশা (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে যান। এই যুদ্ধের আগে পর্দার বিধান নাজিল হয়েছিল। হজরত আয়েশাকে উটের পিঠে পালকির ওপর বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে হজরত আয়েশাকে বড় অপবাদও দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে আয়াতও নাজিল করেছেন। (বুখারি)

এ ছাড়া অন্যান্য সফরে অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে নেওয়ার কথাও হাদিসে এসেছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সফরে নবীপত্নী উম্মে সালামা (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কোরাইশদের কাছে এই সন্ধি করতে রাজি ছিলেন না অনেক সাহাবি। এই চুক্তির কারণে তাই সাহাবিরা বিমর্ষ ছিলেন।হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শেই তাঁদের শান্ত করেছিলেন মহানবী (সা.)। (বুখারি)

ভ্রমণে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে স্ত্রীদের কে যাবেন—তা নিজের ইচ্ছেমতো ঠিক করতেন না। বরং তিনি তাঁদের মধ্যে লটারির আয়োজন করতেন। লটারিতে যাঁর নাম আসত, তিনিই হতেন মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) সফরের ইচ্ছে করলে স্ত্রীদের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা করতেন। যাঁর নাম আসত, তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন তিনি। এ ছাড়া (রাতযাপনের ক্ষেত্রেও) প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক দিন এক রাত নির্দিষ্ট করে দিতেন। ...' (বুখারি

৯) পরামর্শ করা : স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে কাজ করা এটাও নববী সুন্নত। যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে পরামর্শ করে কাজ করে সেই পরিবারে অশান্তি খুব কমই লাগে। লাগলেও তারা সেদিন মিটমাট করে নিতে পারে। স্ত্রী যেহেতু ঘরের রানী। ঘরেই তাঁর রাজত্ব। তাই ঘরের যে কোন বিষয়ে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। যে পুরুষেরা মহিলাদের ঘরের কাজের বেশি ভুল ধরে সেখানে অশান্তি দানা

বাঁধে। একে অপরের কাজে দায়িত্বশীল থাকতে হবে এবং একে অপরের কাজকে শ্রদ্ধা করতে হবে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবিরা শোকে ও ক্ষোভে মহানবী (সা.)-এর আদেশে পশু কোরবানি ও মাথা মুণ্ডন করতে দ্বিধা করছিলেন। তখন উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শে রাসুল (সা.) নিজে কোরবানি করে মাথা মুণ্ডন করেন, যা দেখে সাহাবিরা সাথে সাথে তাঁর অনুসরণ করেন। তাই প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অপরের কাজে পরামর্শ করা এবং একে অপরের কাজে শ্রদ্ধাশীল থাকা। তবে নিজের পরামর্শ সব সময় যে গ্রহণযোগ্য হবে তেমন টাও না। তাই মতামত ব্যক্ত করার পর সেটা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে কষ্ট পাওয়া যাবে না। সংসারে অনেক স্ত্রীরা স্বামীর উপর এভাবে কর্তৃত্ব খাটাতে চায় যা খুবই নিন্দনীয়। এভাবে সংসারে অশান্তি দানা বাধে। তাই সঠিক সময় সঠিক পদক্ষেপে পরামর্শ গ্রহণ করে আগাতে হবে ।

১০) ফ্যামিলি লাইব্রেরি গড়ে তোলা : প্রত্যেক পরিবারের যেন একটি স্বপ্ন হয় পারিবারিক লাইব্রেরির ঘরে তোলা। যেখানে ছোট থেকে বড় সকল বয়সের উপযোগী ইসলামী বই পত্র থাকবে ।

১১) পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা : কম্প্রোমাইজ এন্ড সেক্রিফাইস হচ্ছে শান্তির গোপন মন্ত্র। পরস্পর কারো দোষ খোঁজা যাবে না। একে অপরের প্রতি ছাড় দেওয়ার মন মানসিকতা থাকতে হবে। একে অপরের বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একে অপরের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ পরিবার হবে শান্তিময়।

১২) পরিবারের সদস্যাদের জন্য একসাথে দুয়া করা : পরস্পরের জন্য দোয়া করাও সুন্নাত। ছোটদেরকে ছোট থেকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করতে হবে । যথাসম্ভব বড়রা বাড়িতে রিমাইন্ডার দিয়ে দিবে দুয়া করার জন্য। দোয়া কবুলের সময়গুলো ছোট-বড় সবাইকে বলে দিতে হবে এবং কুরআন - হাদিসের দোয়া গুলো ছোট বড় সকলকেই যথাসম্ভব করার চেষ্টা করতে হবে ।

১৩) পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে দ্বীনী বিষয় শিক্ষা দেয়া : পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে যেটাই ভালো কথা শুনবে অপরকে সেটা শোনাবে। এভাবে একে অপরের মাঝে দ্বীনিশিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে।

মহিলাদের চাকরির বিষয়ে কিছু কথা এবং ইসলাম কি বলে?

খুব জরুরত না হলে মা-বোনদেরকে ক্যারিয়ার থেকে ঘরকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত । আল্লাহ তাআলা বলেন,
আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়া যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না । (সুরা আহযাব : আয়াত ৩৩)

মহিলাদের চাকরির ব্যাপারে কিছু কথা :

ইহুদি-খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে মেয়েদের কিছু সাধারণ কথা হয়ে গেছে জীবনে সফল হতে হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, চাকরি না পেলে বিয়েই করব না, আগে চাকরি তারপর বিয়ে, একটা হাসবেন্ড গেলে আরো অনেক হাসবেন্ড পাওয়া যাবে কিন্তু একটা ভালো জব চলে গেলে ভালো জব পাওয়া যাবেনা তাইতো প্রথম প্রাধান্য চাকরি (নাউজুবিল্লাহ)

বিবাহের পূর্বে মহিলাদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার পিতার উপর। পিতা না থাকলে বড় ভাই বা অন্যান্য গার্জিয়ানদের উপর। আর বিবাহের পর তার স্বামীর উপর অতঃপর ছেলের উপর। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মহিলাদের যাতে পেরেশান না হতে হয় সে ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করে দিয়েছেন ।
তবে যদি দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি না থাকে অথবা থাকা সত্ত্বেও দেখাশোনা না করে বা করতে না পারে, তখন নিজে চলার জন্য নারী এমন কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে যেখানে শরয়ী পর্দা লঙ্ঘিত হবে না।

মহিলাদের চাকরির বিষয়ে ইসলাম কি বলে?

প্রয়োজন, অপরাগতা কিংবা ঠেকায় পড়ার পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শরীয়ত তাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করে নি, যার কারণে তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

‘আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াত যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।’ সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

‘নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচে’ নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকে।’ তাবরানী, হাদীস নং- ২৯৭৪

নারী মসজিদে যাওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُن ‘তাদের জন্য তাদের ঘর উত্তম।’ আবু দাউদ, হাদীস- ৫৬৭

নারী চাকরির খাতিরে ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে এর জন্য কিছু নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। নিয়ম ও শর্তগুলো মেনে চললে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয হবে; অন্যথায় নয়।

যেমন,

– যদি সত্যিকারে তার চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে।

– চাকরিটা তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামনজস্যশীল হতে হবে। যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা হতে হবে।

– কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

– চাকরির কারণে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে সফর করতে না হয়।

– কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী যাওয়া, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

– নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। যদি চাকরি করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যাপক অসুবিধা হয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে না। (ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১ ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯)

মহিলাদের জন্য পর্দা রক্ষা করে ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করা জায়েজ আছে। তবে এক্ষেত্রে যেন পর্দা লঙ্ঘণ না হয়, সেই সাথে শরয়ী অন্য কোন বিধান লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

হ্যাঁ, যদি উপার্জন সক্ষম কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে, বা অভিভাবক থাকে, তাহলে মহিলাদের জন্য ব্যবসা ও চাকরীর জন্য বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

শরয়ী পর্দা ও বিধান অনুসরণ করে মহিলাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তা'ই শরয়ী কোন কারণ ছাড়া মহিলাদের ব্যবসা করা ও চাকুরী করাকে হারাম বলার সুযোগ নেই। -তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯)

তবে যদি পর্দা লঙ্ঘণ হয়, পুরুষদের মিলে একসাথে কাজ করতে হয়, সেই সাথে ফিতনার আশংকা হয়, তাহলে জায়েজ নেই।

ولها ان تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصيغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى مالا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبى، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدى إلى فوات ما يجب عليها نحو اسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم (فقه النوازل-3/359

যার সারমর্ম হলো শরয়ী সীমারেখার থেকে প্রয়োজনে মহিলাদের জন্য শিক্ষাদান, ব্যবসা বানিজ্য,,,,ইত্যাদি করা জায়েজ আছে।

কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট

যারা কম্বাইন্ড ফ্যামিলিতে থাকেন অর্থাৎ বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী একসাথে। এক্ষেত্রে স্বামীর বড় ভূমিকা রাখা দরকার। দুইটা অধিকার মা ও ওয়াইফের । দুইটাকেই সমান এবং স্ট্রিকলি দেখতে হবে।

মায়ের জন্য স্ত্রীর অধিকার কিংবা স্ত্রীর জন্য মায়ের অধিকার নষ্ট করা চলবে না। মা ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে অপরদিকে স্ত্রীও তার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। স্ত্রী তার ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এসেছে হাজবেন্ডের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। মা যখন দেখে ভালোবাসার অর্ধেক স্ত্রী নিয়ে গেছে আবার অপরদিকে স্ত্রী যখন দেখে তার ভালোবাসার অর্ধেক মায়ের কাছে এই বিষয়টা থেকে মূলত সম্পর্কের পতনের সূচনা হয়। মূলত এটি ভালোবাসার কম্পিটিশন অন্য কোন বিষয় না।

তাই এই দুটি সম্পর্কেই কোন যুক্তি তর্ক চলেনা বরং দুটি সম্পর্কই হলো ভালোবাসার ।

মা ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার কয়েকটি টিপস :

১) সাংসারিক কাজ ভাগ করে দেওয়া ।
২) মা-বউকে কিছু দেওয়ার সময় কিছু বিষয় গোপন রাখা।
৩) মা-বউ এর কোন বিচারে অ্যাকশনে না গিয়ে বরং তাকেই সান্তনা দেওয়া। পরে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখানো ।

৪) যথাসম্ভব স্ত্রীকে মায়ের কাছে, আপন মা ও মেয়ের মতো উপস্থাপন করা ।

যদি বউ-শাশুড়ির মাঝে মিল মহব্বত কম থাকে এবং কাজ করতে গিয়ে ঝামেলা লাগার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাদেরকে বাড়ির কাজ বিশেষ করে রান্না ভাগ করে দেওয়া। এক বেলা মা রান্না করবে এবং একবেলা স্ত্রী। তবে স্ত্রী যদি দুবেলায় রান্না করতে চায় এবং শাশুড়ি ও তাদের সম্মত হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। তবে শাশুড়ি যদি দুবেলায় রান্না করতে চায় তবে তাকে বুঝিয়ে অন্তত একবেলার রান্না স্ত্রীকে করতে দেওয়া। এভাবে রান্না করলে একে অপরের কাজে স্বাধীনতা থাকবে এবং যে যার মন মতো কাজ করতে পারবে।

আরেকটা বিষয় মায়ের জন্য যত ইচ্ছা খরচ করেন কিন্তু সব সময় স্ত্রীকে পুরোটা জানানোর দরকার নেই আবার একই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্যও করেন সবগুলো মাকে জানানোর দরকার নেই। তবে স্ত্রী কেনাকাটা করতে গেলে স্ত্রীকে শিখিয়ে দেওয়া যেন মায়ের জন্য কিছু নেয়। হাদিয়া পেলে সবারই ভালো লাগে। শাশুড়ি যখন দেখবে বৌমা তার জন্য কিছু নিয়ে এসেছে তাহলে তার মন খুশি হতে পারে। সম্পর্কের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যেতে পারে। মা এবং স্ত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সেগুলো অপর পক্ষের কাছে গিয়ে না বলাই উত্তম। তাহলে সম্পর্কে আরো নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে স্ত্রীকে যথাসম্ভব বোঝানো এবং মাকেও আলাদাভাবে বোঝানো । তবে দু পক্ষের কথা শুনে একজনের জন্য আরেকজনকে কটু কথা বলে কষ্ট দেওয়া যাবে না। মা এবং স্ত্রী দুজনেই মোহাব্বতের । মা আমাদের গর্ভে ধারণ করে এবং দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের বড় করে তাই তারা যেন কোনক্রমে কষ্ট না পায়। অপরদিকে স্ত্রীও তার পুরো পরিবার ছেড়ে আপনার ভরসায় আপনার হাত ধরে আপনার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আপনার কাছে চলে এসেছে। তাই ভরসার জায়গাটি নষ্ট করবেন না । একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চললে সংসারে সুখী থাকা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের প্রত্যেকের পরিবারকে জান্নাতি পরিবার হিসেবে কবুল করুন এবং দুনিয়াতে মিল-মহব্বতে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন ।

নবিজির সংসার

আমরা যাকে না দেখে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবিজি হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনিতো ছিলেন এই বিশ্বজাহানের সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। তাইতো আমরা আমাদের জীবনের পরতে পরতে তাঁকেই অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করি। তিনি যেমন আমাদের না দেখেই আমাদেরকে ভালোবেসেছিলেন, আমাদের জন্য দুয়া করেছিলেন আমরাও তেমনি তাঁকে না দেখে ভালোবেসেছি, তাকে অনুসরণের চেষ্টা করি। একবার রাসুল (সা.) সাহাবীদের বললেন,
আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি । সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবা। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। (মুসলিম:৪৭২)

আমাদের পরিবারগুলো আজ ভাঙনের পথে। চারদিকে তাকালেই শুধু দেখতে পারবো অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলছে। কোথাও একটুখানি সুখের দেখা সহজে পাওয়া যায়না। বেশিরভাগ পরিবারেই পারিবারিক কলহ। ৬ মাস যেতে না যেতেই সংসার গুলো ভেঙে যাচ্ছে। এগুলোর মূল কারণ কি? আমরা আজ ইসলাম থেকে দূরে, ইসলাম নাম শুনলে গাত্রদাহ শুরু হয় অথচ আমরা মুসলিম। মুসলিম বললে ভুল হবে নামমাত্র মুসলিম । যিনি আমাদের পথ দেখাতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমরা সেই পথ থেকে দূরে। আমরা রাসুলের শিক্ষা থেকে দূরে। তাঁর শিক্ষায় কি নেই? পারিবারিক জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন, সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুমানো অবধি কোন নিয়ম রাসুল (সা.) শিখিয়ে জাননি। আমরা আজ তাঁর অনুসরণ থেকে দূরে। স্ত্রী,সন্তান,বন্ধু,প্রতিবেশি কার সাথে কিভাবে চলতে হবে সবই তিনি শিখিয়ে গেছেন। রাসুলের সুন্নাহ ভুলে আজ আমরা পশ্চিমা শিক্ষা গলাধঃকরণ করছি পরিশেষে আমরা পাচ্ছি একটা অসুস্থ প্রজন্ম । যেখানে স্ত্রী-সন্তানের সাথে দূরত্ব, সন্তানের সাথে মা-বাবার দূরত্ব সবদিক দিয়েই দূরত্ব। কারো সাথে কারো মিল-মহব্বত নেই। এসব থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় রাসূল (সা.) এর শিক্ষাকে অনুসরণ করা। তবেই নিজেদের পরিবারগুলোকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবো। রাসূলের শিক্ষাকে অনুসরণ করলেই একটি পরিবার হবে ইসলামী পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। আমরা যদি নবিজী (সা.) এর সংসার জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো স্ত্রীদের সাথে

নবীজির সম্পর্ক ছিল মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। তাদের সাথে তাঁর আচরণ সর্বকালের সবার জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। নবীজির জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি তিনি তার স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। তারা তাকে ছাড়া তাদের জীবন কল্পনা করতে পারতেন না। এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাদের এ সুযোগও দিয়েছিলেন তারা চাইলে তার সাথে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এর কারণ ছিলো উদারতা ও দানশীলতার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যের মাঝেই জীবন যাপন করতেন কিন্তু তাঁরা তাকে ছেড়ে যাননি ।

নবীজির ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে নয় জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ তাঁর আগেই মারা যান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে সুখী জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহর বাণীতে উঠে এসেছে তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবনযাপন করো। (সুরা নিসা : আয়াত ১৯) স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি। আর কেনইবা হবেননা, তিনিতো নিজেই বলেছেন,, - তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম। নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীদের সাথে আচরণে সর্বোত্তম। (তিরমিযী : হা/ ৩৮৯৫)। একটি হাদিস থেকে আমরা অনুমাণ করতে পারি তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে কতটা সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন।

নবীজি (সা.) সবচেয়ে ন্যয়সঙ্গতভাবে মানবিক মূল্যবোধ এর উপর ভিত্তি করে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন পারস্পরিক প্রেম, স্নেহ, দয়ার দৃঢ় বন্ধনে সম্পর্কগুলো কিভাবে জুড়ে রাখতে হয়। তিনি যেমন শিখিয়েছেন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে বিয়ের বৈধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কিভাবে তাদের প্রকৃতগত সহজাত কামনা ও ভালোবাসা লাভ করতে পারবে, তেমনি একই সাথে বিয়ের বাহিরে কামনা চরিতার্থ করার নিষিদ্ধ সব পথ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দম্পতির কোন এক পক্ষের পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণের সুযোগ না রেখে বরং উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার পথ বাতলে দিয়েছেন। এভাবে উভয় পক্ষকে অপর পক্ষের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। বিয়ের পর সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার সব উপকরণে তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন ।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা আমাদের আদর্শ হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসুলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ।" (সুরা আহযাব : আয়াত ২১)

সব মুসলিমকেই তাই তার অবস্থান অনুযায়ী নবীজিকে অনুসরণ করতে হবে। এজন্য তার সম্পর্কে জানতে হবে একজন প্রকৃত স্বামী, প্রকৃত শাসক, একজন প্রকৃত নেতা হতে হলে নবীজির সম্পর্কে জানতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অনুকরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

স্ত্রীদের সাথে নবীজির আচরণ প্রতিটি স্বামীর জন্য অনুপম আদর্শ। তার আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি স্বামী তার ঘর আলোকিত করতে পারবে। এভাবে প্রতিটি ঘর যদি আলোকিত হয় আর পুরো সমাজ আলোকিত হবে ।

নিম্নে রাসূল (সা.) স্ত্রী, সন্তান,নাতি,আত্নীয়,অতিথি,সাহাবা সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন তা তুলে ধরা হলো -

স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবিজি (সা.)

১) নবীজি(সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন।

২) প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন।

৩) ইবাদতে সময় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদেরকেও সময় দিতেন।

৪) ভ্রমনের সময় স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন।

৫) স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন তৎপর।

৬) খাদিজা (রা.) এর নাম বলার সময় তার প্রশংসা করতেন।

৭) খাদিজার (রা.) কথা মনে পড়লে খুশি হয়ে উঠতেন।

৮) খাদিজার (রা.) বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন।

৯) স্ত্রীদের সাথে উদার আচরণ করতেন।

১০) স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

১১) বাসা থেকে বের হবার সময় স্ত্রীকে চুমু দিতেন।

১২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু পান করার পর তার পান করার স্থানে ঠোট লাগিয়ে পান করতেন।

১৩) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন।

১৪) একই চাদরের নিচে স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাতেন।

১৫) স্ত্রীর সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

১৬) আদর করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন।

১৭) স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন।

১৮) স্ত্রীরা দেখা শেষে চলে যাবার সময় নিজে এগিয়ে দিতেন।

১৯) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন।

২০) কখনোই স্ত্রীদের মারেননি বা সমালোচনা করেননি।

২১) নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন।

২২) স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

২৩) অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিতেন।

২৪) অসুস্থ হলে রুকইয়া করতেন।

২৫) স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণ ও সহ্য করতেন।

২৬) বাসার কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন।

২৭) শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন।

২৮) ঘুম থেকে উঠেই দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন।

২৯) সবসময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

৩০) স্ত্রী জন্য নিজেকে সুশোভিত করতেন ও অন্যদের নির্দেশ দিতেন।

৩১) স্ত্রীর কাছে নবীজী (স.) তাঁর চুল ধুয়ে ও আঁচড়িয়ে নিতেন।

৩২) হারাম না হলে স্ত্রীদের অনুরোধ মানার চেষ্টা করতে।
৩৩) জায়েজ কবিতা শোনার ব্যাপারে স্ত্রীদের নিষেধ করেননি।

৩৪) অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে আয়েশাকে রাযি. খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩৫) স্ত্রীর সঙ্গে নবীজি (সা.)দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন।

৩৬) সফরে রাতের বেলা স্ত্রীর সাথে গল্প করতে।

৩৭) স্ত্রীদের একসাথে মজা করতে দেখে হাসতেন।

৩৮) স্ত্রীর ধাঁধা শুনতেন।

৩৯) অন্য নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁর স্ত্রীদের ঘরে তুলেছেন।

৪০) স্ত্রীদের ইবাদত সম্পর্কে শেখাতেন।

৪১) মন্দের অনিষ্ঠ থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে তাদের শেখাতেন।

৪২) তাদের উপকারী দোয়া শেখাতে।

৪৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদতগুলো শেখাতে।

৪৪) ইবাদতে নিজের উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন।

৪৫) পরিমাণে অল্প হলেও ইবাদত নিয়মিত জারি রাখতে উৎসাহ দিতেন।

৪৬) বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন।

৪৭) যারা দান করবে তারা জান্নাতে তাঁর সাথে সবার আগে মিলিত হবে।

৪৮) সচ্চরিত্র শেখাতেন।

৪৯) জ্ঞান ছাড়াই কোন বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন।

৫০) তাকওয়া অর্জন ও ভালো ব্যবহার করতে বলতেন।

৫১) সহনশীলতা, উদারতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন।

৫১) ভালো কথা বলতে উৎসাহ দিতেন এবং অসার কথাবার্তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিতেন।

৫৩) স্ত্রীদের আকিদা সম্পর্কে শেখাবেন।

৫৪) মানুষের আকিদা সংক্রান্ত ভুলগুলো সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

৫৫) তাঁর ঘরে কোন পাপ না ঘটার ব্যাপারে সজাগ থাকতেন।

৫৬) মন্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

৫৭) অস্পষ্ট ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে স্ত্রীকে উৎসাহ দিতেন।

৫৮) মন্তব্য ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

৫৯) ছোট ছোট পাপের ব্যাপারে স্ত্রীদের সাবধান করতেন।

৬০) স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজির গাইরাহ কাজ করতো।

৬১) কখনো স্ত্রীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা রাখতেন না বরং ছাড় দিতেন।

৬২) প্রজ্ঞার সাথে স্ত্রীদের ঈর্ষার ব্যাপার গুলো সামলাতেন।

সন্তানদের সাথে যেমন ছিলেন নবিজি (সা.)

১) নবিজী (সা.) সন্তানদের সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতেন ।

২) জন্মের দিনেই সন্তানের নাম ঠিক করতেন ।

৩) তাঁর কন্যাদের সর্বোত্তম মানুষদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

৪) বিয়ে দেওয়ার সম তাঁর মেয়েদের মতামত জিজ্ঞস করতেন ।

৫) তাঁর কন্যাদের মোহরানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না।

৬) বিয়ের পরেও তাঁর কন্যাদের যত্ন নিতেন ।

৭) মেয়ে ও জামাতার মনোমালিন্যে হস্তক্ষেপ করতেননা।

৮) কন্যাদের কেউ তাঁর কাছে বেড়াতে এলে স্বাগতম জানাতেন ।

৯) কন্যাদের এমন ভাবে বড় করেছেন যেন তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে ।

১০) দুনিয়া আখিরাতে সর্বত্তম হওয়ার ব্যাপারে সন্তানদের শেখাতেন ।

১১) ফাতিমা (রা.) কে নিজের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে বলতেন ।

১২) ফাতিমা (রা.) কো তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ দিতেন ।
১৩) কন্যাদের তিনি খুশি করার চেষ্টা করতেন ।

১৪) নবিজী (সা.) কন্যাদের উপহার দিতেন ।

১৫) কন্যাদের স্বান্তনা দিতেন এবং ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিতেন ।

১৬) সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন ।

নাতিদের সাথে যেমন ছিলেন নবিজী (সা.)

১) বাচ্চাদের তাহনিক করাতেন।

২) কোলে নাতি প্রসাব করলে রেগে যেতেন না।

৩) নাতিদের মসজিদে নিয়ে যেতেন।

৪) সালাতের মধ্যে শিশুদের খেলাধুলা সহ্য করতেন।

৫) হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়লে রাগ করতেন না।

৬) নবীজি সা.) নাতিদের অনেক ভালোবাসতেন।

৭)। নাতিদের কোলে নিয়ে চুমু দিতেন।

৮) নবিজী (সা.) তাদের নিজের কাঁধে চড়াতেন।

৯) নাতিদের বাহনে উঠিয়ে নিতেন।

১০) শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতেন।
১১) নাতিদের জন্য দুয়া করতেন।

১২) হাদিয়া পেলে তার একটি অংশ নাতিদের দিতেন।

১৩) হারাম থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন।

আত্নীয়দের সাথে যেমন ছিলেন নবিজী (সা.)

১) নবিজী আত্নীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলতেন।

২) নবিজী (সা.) তাঁর মায়ের কবর দেখতে গিয়ে কাঁদতেন।

৩) নিকটাত্নীয়দের ইসলামের দিকে ডাকতেন।

৪) চাচা আবু তালিবকে পথপ্রদর্শনে আগ্রহি ছিলেন।

৫) চাচা আব্বাসের সাথে পরামর্শ করতেন।

৬) আত্বীয়দের আমল সংশোধন করতেন।

৭) কেউ পাপ করতে গেলে তাকে থামাতেন।

৮) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আত্নীয়দের সাহায্য চাইতেন।

৯) আত্নীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন।

১০) আত্নীয়দের প্রতি উদার আচরণ করতেন।

১১) নবিজী (সা.) আত্নীয়দের হজ্বের ব্যাপারে অনেক আগ্রহী ছিলেন।

১২) আত্মীয়ের স্বাস্থ্য ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন।

১৩) আত্বীয়দের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন।

১৪) আত্নীয়দের জন্য আল্লাহর নিকটে দুয়া করতেন।

১৫) অসুস্থ হলে আব্বাস (রা.) কে দেখতে যেতেন।

১৬) আত্মীয় হলেও ইসলামের ব্যাপারে কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না।

অতিথিদের সাথে যেমন ছিলেন নবিজী (সা.)

১) মেজবানের আতিথেয়তার সীমা নবিজী (সা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

২) নিজের ক্ষুধা ও কষ্টের সময়েও উদারতা দেখাতেন।

৩) মেহমানদের সাথে বসে একসাথে হেসে গল্প করতেন।

৪) কাফের হলেও মেহমানকে নবীজি (সা.) সম্মান করতেন।

৫) নবীজি (সা.) অতিথিদের নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করতেন।

৬) মাঝে মাঝে নবীজি (সা.) মেহমান হিসেবে কিছু সাহাবীদের বাসায় যেতেন।

সাহাবীদের সাথে যেমন ছিলেন নবিজী (সা.)

১) নবিজী (সা.) প্রকাশ্যে তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন।

২) সাহাবীদের সম্পর্কে কটু কথা নবিজী (সা.) সহ্য করতেন না।

৩) ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সম্মান করতেন।

৪) ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সম্মান করতেন।

৫)অন্য সাহাবীদের তুলনায় ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের বেশি প্রাধান্য দিতেন।

৬) অন্যদের চেয়ে সাহাবীদের প্রতি বেশি সহনশীল ছিলেন।

৭) ব্যক্তিগত বিষয়েও সাহাবীদের ওপর আস্থা রাখতেন।

৮) কোনো সাহাবী অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নিতেন।

৯) সাহাবীদের বিপদে খোঁজ নিতেন।

১০) সাহাবীদের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেতেন এবং কাঁদতেন।

১১) সাহাবীদের মতামত ও পরামর্শ শুনতেন।

১২) সাহাবাদের জীবনযাপন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন।

১৩) কোনো কারণে সম্পদের অংশ দিতে না পারলেও সাহাবীদের খুশি রাখতেন।

১৪) প্রত্যেক সাহাবীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করতেন।

১৫) উসমান (রা.) এর লজ্জার ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন ।

১৬) সাহাবীদের ভালো পরিণতি ও জান্নাতের সুস্‌ংবাদ দিতেন।

অতি সংক্ষিপ্ত কথায় নবিজি (সা.) এর সাংসারিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তিনি তাঁর বিবিদের সাথে, সন্তানদের সাথে, নাতীদের সাথে, আত্নীয়-মেহমান ও সাহাবীদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন তা থেকে যদি আমরা শিক্ষা নেই আমাদের পারিবারিক ও আত্নীক বন্ধনগুলো মজবুত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনিতো আমাদের আদর্শ। তিনিতো ছিলেন এই বিশ্বজাহানের জন্য একজন শিক্ষক। তিনি যেভাবে শিখিয়েছন সেভাবেই কল্যান। কল্যানতো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দেখানো পথে।

কিছু নাসিহা

১) বাড়ি বানানোর জন্য সুন্দর জায়গা নির্বাচন করা ও তার জন্য নকশা তৈরি করা।

২) বাড়ি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করা। দুষ্ট প্রতিবেশি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া।

৩) প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ ও প্রয়োজনীয় আরামের জিনিসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা।

৪) ঘরে কুকুর আনা যাবে না ও কুকুর প্রীতি ছাড়তে হবে।

৫) ঘরে ধূমপান নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬) বাড়ি থেকে মনিটর তথা টেলিভিশন অপসারণ করতে হবে ।

৭) খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়রে মাহরাম কোন পুরুষ ঘরে প্রবেশ করতে না পারে ।

৮) পারিবারিক সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করবে ।

৯) বাড়ির কাজের লোক ও গাড়ির ড্রাইভার দের থেকে খুবই সাবধান থাকতে হবে।

১০) মেয়েলি স্বভাবের পুরুষদেরকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না ।

১১) ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা।

১২) আত্বীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

১৩) আয় অনুযায়ী ব্যয় করা।

১৪) সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

১৫) সকল ধরণের বদ অভ্যাস ত্যাগ করা।

১৬) নারী-পুরুষ উভয়ের চোখের হেফাজত করা।

১৭) পরিপূর্ণ পর্দা করা।

১৮) ফরজ ইবাদাতের পাশাপাশি সুন্নত ও নফল আদায়ের চেষ্টা করা।

১৯) হালাল -হারাম মেনে চলা।

দৈনন্দিন কিছু আমল

আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য। তাই বান্দা হিসেবে আল্লাহর হক পালন করা আমাদের সকলের জন্য ফরজ। আল্লাহর হক পালনের জন্য আমরা দৈনন্দিন কিছু অত্যাবশ্যকীয় আমলের পাশাপাশি বিশেষ কিছু আমল করি। নিম্নে আমলগুলো দেয়া হলো-

১) ৫ ওয়াক্ত সলাত আওয়াল ওয়াক্তে পড়া এবং পুরুষেরা জামাআতের সাথে পড়া। তবে সুন্নত ও নফল গুলো ঘরে আদায় করার চেষ্টা করা।

২) নিয়মিত তাহাজ্জুদের সলাত আদায়ের চেষ্টা করা। সম্ভব না হলে এশার সাথে ২,৪,৮ যে যার সুবিধামতো তাহাজ্জুদের নিয়তে নফল নামাজ পড়ে নেওয়া। এরপর বিতর পড়ে ঘুমানো।

৩) ইশরাক ও চাশতের নামাজ আদায়ের চেষ্টা করা। নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে পড়া।

৪) ফরজ নামাজের পরে মাসনুন দুয়াগুলো পড়া।

৫) ফজরে সুরা ইয়াসিন, মাগরীবের পরে সুরা ওয়াকিয়া এবং ঘুমানোর আগে সুরা মুলক তেলাওয়াত করা এবং দৈনন্দিন খতমের নিয়তেও তেলাওয়াত করা।

৬) তর্জমা ও তাফসীর পড়া। দিনের শুরুতেই তাফসীর পড়া। এবং ঘুমানোর আগে সীরাহ পড়া।

৭] সকাল-সন্ধ্যার হেফাজতের আমলগুলো রেগুলার করা। সঠিক সময়ে সম্ভব না হলে যখনি মনে পড়বে তখনি করে নেয়া।

৮) ঘুমানোর আগের আমলগুলো করা। যেমন- সুরা বাকারার শেষ দুই অথবা তিন আয়াত, তিন তাসবীহ, তিন কূল, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা, ঘুমানোর দুয়া পড়া এবং ডান কাত হয়ে ঘুমানো। তবে আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেয়া এবং তিনকূল পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে পুরে শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার মাসাহ করা। এছাড়াও দরুদ ও ইস্তিগফার, সুরা ফাতিহা পড়া এবং সবাইকে ক্ষমা করে ঘুমানো। এক কথায় ঘুমানোর সকল সুন্নাহ আদায়ের চেষ্টা করা।

৯) সকল কাজে সুন্নাহ অনুসরণের চেষ্টা করা এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মেসাওয়াক না করা। মেসাওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও মেসাওয়াক করা।

১০) সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দুয়া ও জিকিরগুলো করা এবং দরুদ ও ইস্তিগফার বেশি বেশি পড়া।

উপসংহার

পরিবার মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান প্রতিষ্ঠান, যেখানে একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে ওঠে এবং তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তি নির্মিত হয়। তাই একটি পরিবার যদি ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে গড়ে ওঠে, তবে তা শুধু পরিবারের সদস্যদের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের উৎস হয় না; বরং একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠারও শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে ওঠে। ইসলামী পরিবারব্যবস্থা মানুষের জীবনে ভালোবাসা, দয়া, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দেয়, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

ইসলাম পরিবারকে শুধুমাত্র রক্তের বন্ধন হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি পবিত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা, সন্তানদের সুশিক্ষা ও উত্তম চরিত্র গঠন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং পারিবারিক জীবনে ইসলামের বিধান অনুসরণ—এসবের সমন্বয়েই একটি প্রকৃত ইসলামী পরিবার গড়ে ওঠে। এমন পরিবারে শান্তি থাকে, বরকত থাকে এবং আল্লাহর রহমত সর্বদা বিরাজ করে।

বর্তমান যুগে যখন নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক অস্থিরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজকে ক্রমাগত গ্রাস করছে, তখন ইসলামী পরিবারব্যবস্থার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। কারণ একটি আদর্শ পরিবারই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ, নৈতিক, দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। আর এমন পরিবারগুলোর সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে একটি সুন্দর, সুসংহত ও কল্যাণময় সমাজ।

সর্বোপরি বলা যায়, ইসলামী পরিবার গঠন কেবল একটি পারিবারিক কর্তব্য নয়; এটি একটি ইবাদত, একটি সামাজিক দায়িত্ব এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজেদের পরিবারকে গড়ে তোলা, যাতে আমাদের ঘরগুলো ভালোবাসা, শান্তি ও নৈতিকতার আলোয় আলোকিত হয়। কেননা আজকের আদর্শ ইসলামী পরিবারই আগামী দিনের আদর্শ সমাজ এবং সফল জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে গড়ে ওঠা পরিবারই পারে দুনিয়ায় প্রশান্তি এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী মুক্তি ও সফলতার পথ সুগম করতে।

তথ্যসুত্র

১) ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়।

২) আদর্শ পরিবার সিরিজ।

৩) আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ।

৪) আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার

৫) দ্যা কেয়ারিং হাজবেন্ড এন্ড দ্যা কেয়ারিং ওয়াইফ।

৬) নবিজীর সংসার।

৭) প্যারেন্টিং।

৮) গুগল,চ্যাটজিপিটি, আই ফতোয়া, মাসিক আল-কাউসার ইত্যাদি